মধুমতী

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা পাবলিশার্স : কলিকাতা-১৪

কল্লুকে

॥ লেখকের অন্যান্য বই

রাগিণী

আমার পৃথিবী

নিশি জাগে

চন্দন ডাঙ্গার হাট

বোবা ঢেউ

রাত ভোর

॥ বিশেষ কোন পুরুষ বা রমণীর চরিত্রের
প্রতি ইংগিত করে এ উপন্যাস লেখা হয়নি ॥

ভোরের মত ঠাণ্ডা একজোড়া বড় বড় চোখ মেলে তাকালো ইন্দুমতী, একটু ভয়ে ভয়ে বললে,— আমি পারবো না।

কুন্তলবাবু বলে,—কেন?

—আমার ভয় করে।

কুন্তলবাবু আজ আর হাসলো না। একটু বেশী বিরক্ত হোল,—তোমার মত মেয়ে বিয়ে করা অভিশাপ। মিষ্টার বাসু ত' আর বাঘ ভাল্লুক নয়, একটি ভদ্র বন্ধু। তার সামনে বেরুতেও ভয়। ভয়টা তোমার রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখছি।

ইন্দুমতী ভীত চোখের পাতা নামায়, রেডিওর চাবিটা খোলে।

রেডিওর চাবিটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে—কুন্তলবাবু একটু কঠিন গলায় বলে,—আমি বেরোলুম। মিষ্টার বাসু এলে তাকে চা দেবে, গল্প করবে, বসিয়ে রাখবে, এসে যেন আমি এই দেখি।

বাইরে বেরিয়ে যায় কুন্তলবাবু। গাড়ীর শব্দ শোনা যায়।

ইন্দুমতী যেন সমুদ্রে পড়ে।

কোথাকার কোন এক মিষ্টার বাসু স্বামীর আলগা বন্ধু কোন দেড়হাজারী অফিসার তাকে বসিয়ে চা খাইয়ে গল্প করতে হবে। লোকটার চোখদুটো যদি রাঙা ড্যাবডেবে হয়, বা পাকান গোঁপ থাকে থ্যাবড়া মুখে। ইন্দুমতীর বুক টিপ্ টিপ্ করতে থাকে।

কুন্তলবাবুর ওপর রাগ হয় ইন্দুমতীর। বন্ধু মানুষের দুটো থাক, কি চারটে থাক ; এ একেবারে অগুন্তি! দিনরাত্রি চা বন্ধু গল্প বেড়ান

হাসি আর হল্লা। মানুষটা হাসতেও পারে। এক একটা টেবিল চাপড়ানি—হাসিতে ইন্দুমতীর গা কেঁপে ওঠে।

ভাল লাগে না ইন্দুমতীর।

ভাল লাগেনা। কোন রবিবারে ভোর ছটার সময়ই হয়ত কুন্তল বাবু বলে বসল, চলো আজ ডায়মণ্ডহারবারে। গাড়ী চালাবে তুমি।

—ওরে বাবা! ইন্দুমতী সটান বেঁকে বসে। কুন্তলবাবু বহু চেষ্টা করে তাকে বিয়ের পরে গাড়ী চালানো শেখাবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু মাছের ঝালের হলুদ বাঁটার চিন্তা আর লক্ষ্মীব্রতে আমের পল্লবের চিন্তা ইন্দুমতীর মনকে এমন করে জুড়ে ছিল যে সেখানে আর মোটর চালাবার চিন্তার স্থান পাবার উপায় ছিল না। ইন্দুমতীর কি দোষ! ভাল লাগেনা ওর।

হঠাৎ বাড়ী এসে হয়ত কুন্তলবাবু সটান ইন্দুমতীকে কোলে তুলে নেয় প্রচণ্ড হাসতে হাসতে। ইন্দুমতী ইঁদুরের মত ছট্‌ফটিয়ে ওঠে,—উঃ লাগছে! ছাড়! চাকরটা এসে পড়বে।

—আসুকগে।—কুন্তলবাবু হাসতে হাসতে দুটো ঝাঁকুনি দেয় তাকে। প্রাণ বেরোবার জোগাড়।

—ছাড়, তোমার পায়ে পড়ি।—প্রায় কেঁদে ফেলে ইন্দুমতী।

হাসি বন্ধ হয়ে যায়। মুখখানা কালো হয়ে যায় কুন্তলবাবুর। কুন্তলবাবু যা চায়, তা ইন্দুমতীর কাছে পায় না। ইন্দুমতীর কোন দোষ নেই কিন্তু। ওর ভাল লাগে না এসব।

আজ চার বছর বিয়ের ভেতরে, চার চারে ষোলটা পার্টি দিয়েছে কুন্তলবাবু সায়েবী হোটেলে। বড় বড় চাকুরে আর ব্যবসাদারদের পার্টি। কুন্তলবাবু এক মস্ত পাটের কোম্পানীতে সায়েবের পার্টনার। পাটের দর আর পাটের কদর দুটোই সে বোঝে অত্যন্ত ভাল।

উনিশ বছর বয়স থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে উনচল্লিশ বছর বয়সে সে আজ মস্ত বড় মানুষ হতে পেরেছে। এই সাফল্যেই হয়ত বা তার প্রাণের প্রাচুর্য এত প্রচণ্ড যে আশে পাশে মানুষরা ভেসে যেতে চায় সে তীব্র স্রোতের মুখে।

বছর পঁয়ত্রিশ বয়সে একবার ময়মনসিংয়ে গিয়েছিল কুন্তলবাবু পাটের গাঁট কিনতে। উঠল সেখানে সায়েবী পাটের কোম্পানীর বড়বাবুর বাসায়, বড়বাবু যে পাড়ায় থাকেন সে পাড়ায় তার প্রতাপ প্রবল। লাইব্রেরী আর পূজোক্লাবে চাঁদার পরিমানটা তিনি এত বেশী দিতেন —যে সেটা শুধু বিস্ময়ের পর্য্যায়েই উঠত না ভয়েও লোকে সমীহ করত। আঠারো থেকে আটাশ বছুরে ছেলেরা সব তার অতি বাধ্য। কারো মাথা আনতে বললে মাথাটাও নিয়ে আসবে হয়ত। হিংসুক লোকে বলত,—টাকার গরম দেখেচো, পাটের কোম্পানীটা শেষ পর্যন্ত কিনে না ফেলে, চুরী করে ত' কোম্পানীর রাখলে না কিছু!

বলত গোপনে ভয়ে ভয়ে, শুনতে পেলে রক্ষে নেই।

তার বাড়ী অতিথি হলেন কুন্তলবাবু।

আতিথেয়তার ত্রুটিত' কিছু রইলই না, উলটে বাড়াবাড়িতে কুন্তল বাবু হাঁপিয়ে উঠলো যেন, রূপোর থালা বাটিতে চব্বিশ রকম রান্না খাওয়াই শুধু নয়, তার শোবার ঘরটা রোজ গোলাপ জলে মুছে নেয়া হোত শোবার আগে।

তবু কুন্তলবাবু মানীয়ে নিয়েই চলছিলো।

বড়বাবুর চতুর্থ কন্যা সরমা এসে গল্প কোরত মাঝে মাঝে কুন্তল বাবুর সঙ্গে। সরমার বয়েস তখন সাড়ে ষোল। তার সঙ্গে একা একা গল্প করতে একটু যে সংকোচ হোত না কুন্তলবাবুর তা নয়।

হাজার হোক, সে অবিবাহিত।

বললে একদিন তাই—তোমার কোন বন্ধু নেই সরমা ?

—কেন থাকবে না। অনেক আছে।

—অনেক নয়, কোন একজন খুব বেশী বন্ধু।

সরমা বলে,—আছে। কিন্তু কেন ?

বলছিলাম কি দুজনেত ঠিক গল্প জমে না। তাকে না হয় ডেকে আনলেই পারো। তাস--টাসও না হয় খেলা চলত।

বেশ আনব। কাল আনব। কিন্তু সে বড্ড লাজুক।

কুন্তলবাবু বলে—তা হোক, তুমি এনো।

পরদিন বন্ধুটিকে নিয়ে আসে সরমা।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে পালাতে চায় মেয়েটি।

সরমা বলে,—ওই দেখুন কি লাজুক।

টেনে আনে সরমা।

কুন্তলবাবু তাকায়। মেয়েটি বড়বড় চোখের পাতাদুটো তুলে তাকায় একবার। ভীরু চাউনী, অকারণেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের নখে মেজেটা খুঁটতে থাকে।

কুন্তলবাবু ভাল করে তাকায়।

পরনে সাধারণ সাড়ী। হাতে দুগাছা লাল গালার চুড়ী। কপালে কাঁচপোকার টিপ। চুল টেনে বাঁধা পিছন দিকে। দু' একটি খুচরো চুল ওড়ে ছোট ফরসা কপালের ওপর। সরমার সাজ সজ্জার আড়ম্বরের পাশে এ যেন পাণ্ডুর একটি ভোরের নক্ষত্র।

মুগ্ধ হয়ে যায় কুন্তলবাবু।

বলে মিষ্টি গলায়,—আমাকে ভয় নেই। আমি সরমার দাদা।

মেয়েটির মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। আর একবার তাকায়।

বলে কুন্তলবাবু,—তোমার নাম কি ?

—ইন্দুমতী।

—ভারী সুন্দর নাম।

—তোমরা ক' বোন?

—দু' বোন।

—তোমার বাবা কি করেন।

—মাষ্টারী করেন ইস্কুলে।

স্কুল মাষ্টারের মেয়ে। তাইত' এত দরিদ্র। সরমার পাশে মেয়েটি যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চায়।

সরমা বলে,—বোসনা। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

তবু ইন্দুমতী বসে না।

কুন্তলবাবুও বলেন,—বোস না। একটু কথা বোলব। গল্প কোরব। সন্দেটা ভাল লাগে না একা একা।

ইন্দুমতী এবার পায়ের পাতাদুটি ঢেকে পা মুড়ে জড়সড় হয়ে বসে। সরমাও বসে। নানা গল্প হতে থাকে এবার। বেশী কথাই বলে সরমা। ওদের স্কুলের গল্প। ইন্দুমতী আর সরমা একসঙ্গে পড়ত। ক্লাসের পণ্ডিতমশাইকে ভয়ানক ভয় কোরত ইন্দু। পণ্ডিতের গোঁপ জোড়া ছিল পাকান। একদিন চোখদুটো বড় বড় করে ধমক দিয়েছিলেন তিনি ইন্দুমতীকে। ইন্দুমতীর ত' ভয়ে দাঁত পর্যন্ত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল।

—তোকে বলেছে।—ইন্দুমতীর সহজ তর্জন।

কুন্তলবাবু বলে,—তা তেমন ভুতের মত চেহারা হোলে ভয় করবে না?

ইন্দুমতী সমর্থন পেয়ে বলে,—তাছাড়া কি মোটা আর কালো!

কুন্তলবাবু খুব হাসে।

ইন্দুমতী একটু একটু করে সহজ হয়ে আসে।

তবু কথাগুলো সবই ইন্দুমতী বলে সরমার মাধ্যমে। কুন্তলবাবুকে সটান কিছু বলতে পারে না। তাকাতেও পারে না ভালকরে কুন্তলবাবুর দিকে।

কি জানি কেন কুন্তলবাবুর ভয়ানক ভাল লাগে মেয়েটিকে। এত-দিন পাটের কুলি আর দালালের ভেতরই জীবন কেটেছে। জীবনের সবচেয়ে বড় নেশা ছিল টাকা আর টাকার জন্যে চাকার মত এখানে ওখানে ঘোরা।

আজ প্রথম যেন ক্লান্তি আসে কুন্তলবাবুর জীবনে।

মনে হয় কি একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে কোথায়।

ইন্দুমতীর আবির্ভাবে সেটা যেন পূর্ণ হয়ে উঠতে চায়।

আজ অকস্মাৎ মনে হয় কুন্তল বাবুর যে পাটের একটানা দরাদরি আর অংকে মনের অনেকটাই যোগ বিয়োগের মত নিয়ম মাফিক কাটাকুটিতে ক্ষয়ে যাচ্ছে। জীবনের খাতায় জমা হোল না কিছুই। মনে হয় আজ যদি কোন একজোড়া গভীর ভীরু চোখের আড়ালে লুকিয়ে বাঁচতে পারত কুন্তলবাবু! কুন্তলবাবু একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

সেদিন বিকেলে সরমাকে শুধোয় কুন্তলবাবু,—তোমার বন্ধুটি বুঝি খুব গরীব?

সরমা বলে,—হ্যা গরীব ত' নিশ্চয়ই। কিন্তু ব্যবহারে বোঝবার উপায় নেই। বিশেষ করে ইন্দু কথা বলে কম! তবু যতটুকু বলে, আমার সঙ্গেও যেমন, বাড়ীর একটা দাসীর সঙ্গেও তেমন। এত লাজুক, অথচ এমন মিষ্টি ওর কথাগুলো। আমি ত ওকে একদিন না দেখলে থাকতে পারি নে।

কুন্তলবাবু হঠাৎ বলে বসে,—আচ্ছা, ওর বয়েস কত? তোমার

চেয়ে ছোট নয় ?

—না, বরং কিছু বড়ই হবে, মুখটা ভারী কচি কিনা বোঝবার উপায় নেই। আপনি কবে যাবেন এখান থেকে ?—শুধোয় সরমা।

—পরশু।

সরমা বলে,—থাকুন না আর দিনকত। আপনি ভারী মজার লোক। ইন্দুও বলছিলো, বেশ লাগে আপনার সঙ্গে গল্প করতে।

কুন্তলবাবু হাসে,—না, কাজ শেষ হয়ে গেছে। পাট সব চালান শেষ হয়ে এসেছে। মিছিমিছি বসে থেকে কি লাভ ?

—থাকলেই বা।

—কলকাতায় কাজের ক্ষতি হবে।

সরমা ঠাট্টা করে একটু,—কাজের ক্ষতিই দেখলেন, আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে পাবেন না আর, সেটাকে আপনার ক্ষতি বলে মনে হোল না।

কুন্তলবাবু হেসে বলে,—আলাপ যিনি করবেন, তিনি ত' এলেন বলে।

অর্থাৎ সরমার বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে গেছে।

সরমা চোখদুটো নীচু করে ফেলে,—যার তার সঙ্গে যেচে আলাপ করতে দায় পড়েছে।

—কিন্তু দায়টা যে দুপক্ষেরই বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। কুন্তলবাবু প্রাণখুলে হাসে এবার,—বেশত' আসব সঠিক সময়ে। দেখব কেমন কথার ঠিক থাকে।

সরমার মা নিজে হাতে খাবার দিয়ে যায় কুন্তলবাবুকে। এ বাড়ীতে কুন্তলবাবু যেন পরম আত্মীয়। বিশেষকরে বড়বাবুর হুকুম—কুন্তল বাবুর মত পাটের ক্রেতাকে হস্তগত করতে পারলে বেশ দু'পয়সা

কখনও বা বলে,—আপনার আলাপচারিণী এলো বলে, এবার আমরা ত' ফালতো।

কখনও বা,—আমার ঘটক বিদেয় আদায় না করে ছাড়ছিনে।

কুন্তলবাবু শুধুই হাসে।

বিয়ে হয়ে যায়।

বাসর ঘরে ইন্দুমতী ভয়ে জড়সড়। একপাশে বসে থাকে নরম বস্তার মত। কুন্তলবাবু কোন কথারই জবাব পায় না।

ভোর রাতের দিকে কুন্তলবাবু যখন বিরক্ত হয়ে বলে,—কথা না বললে সকালেই চলে যাব।

বেরোতে যায় কুন্তলবাবু।

কিন্তু ইন্দুমতীর হাতদুটো তখন কুন্তলবাবুর পায়ের ওপর, ওর বিনিদ্র চোখ দুটো সজল রাঙা। বলে,—রাগ করবেন না।

কুন্তলবাবু মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত বসে পড়ে।

ইন্দুমতীর চোখদুটোয় কি জানি কেন কুন্তলবাবুর মনের ওপর ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়ে।। শুধু কি সেদিন—আজও কুন্তলবাবুর ভয়াবহ রাগী বা দুর্দম নিষ্ঠুর ভাবকে নিমেষে জল করে দিতে পারে ইন্দুমতীর সজল বড় বড় চোখ দুটো। ওই একজোড়া কালো ডাগর চোখের কাছে কুন্তল বাবুর পৌরুষ পরাজিত হয়েছে। তবু কুন্তলবাবু ভারী খুসী।

ভাবলো একটি নরম ভালো মেয়েকে ভালবেসেছে সে, ক্ষতি জীবনে হবে না একটুও। নরম যখন তখন তৈরী করা যাবে ইচ্ছে মত। কিন্তু কুন্তলবাবু পাট চিনত, মেয়ে চিনতে ভুল হোল তার।

ইন্দুমতী ক্লাস ফাইভ অব্দি পড়েছিলো, কুন্তলবাবু মাষ্টার রেখে দিলো তার—একটি ইউরোপীর মহিলা আর একটি বাঙালী মহিলা, ইংরেজী আর বাংলা পড়াতে।

ইন্দুমতী বাংলা পড়ল, কিন্তু ইংরেজী পড়তে গিয়ে ফিরে এলো।

—গরুখেকো মেম্! আজই বিদেয় কর ওকে।

শুনে কুন্তলবাবু হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ল।

—আমিও ত' কত কি খাই, তুমি কি জানো?

ইন্দুমতী গম্ভীর হয়ে গেলো, কথা বললো না।

পরদিনও যখন ইংরেজী পড়তে ইন্দুমতী গেল না, তার খোঁজ করতে গিয়ে কুন্তলবাবু দেখেন সে লক্ষ্মীপূজো করছে, শুনলো আজ পূর্ণিমা বেস্পতিবার, উপোসও করেছে।

কিছু বলল না কুন্তলবাবু।

পরদিনও ইন্দুমতীকে দেখা গেলনা ইংরেজী পড়তে। কুন্তলবাবু এসে দেখলো গরম কড়াইশুঁটির কচুরী পাকাচ্ছে ইন্দুমতী। কুন্তল বাবু কিছু বলবার আগেই একটা ডিসে তাকে দুখানা এগিয়ে দিয়ে একগাল হেসে বলে ইন্দুমতী,—খাও না দুখানা।

কচুরী খেতে মন্দ লাগল না, কাছে বসে ইন্দুমতী তাকে অনেকগুলো কচুরী খাওয়ালো। কুন্তলবাবু খুসীই হোল। তারপর ঘরে ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে ধমকালো,—আয়না দিয়ে মুখও দেখোনা।

—তোমাকে দেখবার পরে আর সময় থাকে কই!—হাসতে হাসতে বলে কুন্তলবাবু।

মাথাটা কোলের কাছে টেনে চুল আঁচড়ে দিয়ে মুখ মুছিয়ে বললো ইন্দুমতী,—বোস, কফি আনছি।

কুন্তলবাবু ভারী আরাম পেলো। ইংরেজী পড়তে যাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভালো মনে হোল।

ক্রমশঃ ইংরেজী পড়া আর হোল না।

বাংলা পড়াটাই চলল; কিন্তু তাও কিছুদিন পরে ইন্দুমতী বললে

স্বামীকে,—কি হবে ছাই মাষ্টার রেখে, তার চেয়ে বরং বাংলা বই মাসে মাসে কিনে দিও পড়ব।

তাই হবে, কুন্তলবাবু প্রতি মাসে প্রায় শ' খানেক টাকার মত নানা ধরনের বই কিনে দিতে লাগল। বইয়ের আলমারী কেনা হোল। বইগুলো কেনবার পর আনকোরা চালান হতে লাগল আলমারীতে। শুধু সকালে বিকেলে বইগুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করতে পেয়ে ভারী খুসী হোল ইন্দুমতী।

হঠাৎ কুন্তলবাবু শুধোলেন একদিন,—বইগুলো পড়ছ ?

—একা একা কি ভাল লাগে ?—হেসে বলে ইন্দুমতী,—তুমিও না হয় বোস, আমি পড়ে শোনাই।

কুন্তলবাবু চোখ বড় বড় করে বলে,—আমার সময় কোথা ?

ইন্দুমতী মৃদু হেসে জবাব দেয়,—আমারই বুঝি খুব সময় আছে।

—কেন দুপুরে কি করো ?

—বারে বা! তোমার সোয়েটারটা শেষ করতে হবে না! শীত যে এসে পড়ল! গদীটার তলায় ত' দশমন ধুলো পড়েছিলো।

কুন্তলবাবু চা খেতে খেতে হাসলেন,—চাকর ত' রয়েছে তিনটে, ধুলোটা ঝাড়তে পারে না ?

হ্যাঁ! ওরা ঝাড়বে ধুলো! তাহলেই হয়েছে আর কি। আরও ধুলো খানিকটা জমিয়ে দেবে। একটা কাজও কি ওদের দ্বারা পরিষ্কার করে হবার জো' আছে!

—তবে আর এগুলোকে পুষে লাভ কি ? বিদেয় দিলেই ত' হয়!—

ইন্দুমতী যেন অবাক হয়ে বলে,—বা! কি বুদ্ধি! ওরা খাবে কি শুনি। মুকুন্দটার ত' আবার বোনটা বিধবা হয়ে ঘাড়ে পড়েছে

দেশে, ওকে ত' আরও দশ টাকা মাইনে বাড়াতে হবে।

কুন্তলবাবু হো হো করে হেসে ওঠেন,—এর মধ্যে ওদের বাড়ীর দুঃখকষ্টের খবরগুলো সব মুখস্ত হয়ে গেছে। কার কটা ছেলে, কার কটা পিসে, কার কটা মেসো!

ইন্দুমতী ছেলেমানুষী মুখখানা গম্ভীর করে বলে,—ওরা ভরসা করে আছে তোমারই ওপর, তা' ওদের কষ্ট না বুঝলে চলবে কেন? গুরুচরণের দেশের জমী ওদের জমীদার কেড়ে নিচ্ছে, ওকে কিছু টাকা দিয়ে আসচে মাসে পনেরো দিন ছুটী দোব ভাবছি।

কুন্তলবাবু বলে,—দিও।

ইন্দুমতী সায় পেয়ে বলে,—মুখখানা বেচারীর শুকিয়ে গেছে, যদি বউ ছেলেপুলেগুলোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় জমীদার।

কুন্তলবাবু তেমনি স্বরেই বলে,—তাইত,' তবে ত' আমাদেরই ওদের সবাইকে এনে রাখতে হবে!

—তা তেমন হলে —

অকস্মাৎ কুন্তলবাবু বিরক্ত স্বরে বলে,—দেখো, তোমার এই দরদটা আমার বন্ধুবান্ধবের ওপর হয় না কেন বলতে পারো? তারা একটা গান শুনতে চাইলে ত' ঘর থেকে পালাও।

—তোমার বন্ধুরা ত' বড়লোক।

—তুমিও ত' বড়লোকেরই স্ত্রী।

ইন্দুমতী আর কথা বাড়াতে চায় না। কুন্তলবাবু রাগলে ওর বড় ভয় করে। আস্তে আস্তে আহত স্বরে বলে,—তা বটে!

—চাকর বাকরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্যেত' তোমায় বিয়ে করিনি! এ কথাও কি বোঝাতে হবে নাকি?

ইন্দুমতী চুপ করে থাকে।

কুন্তলবাবু ওর নীরবতায় আরও রাগান্বিত স্বরে বলে,—শোন্, কাল সন্ধ্যেবেলা একজন নাচ শেখাতে আসবে তোমাকে। কাল থেকে তোমাকে নাচ শিখতে হবে।

ইন্দুমতী চুপ করে থাকে।

—নাচ-গান চাল চলন কার্টসি এগুলো সব তোমাকে শিখতে হবে। নইলে জেনে রেখো গেঁয়ো ভূতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে না।

বেরিয়ে যায় কুন্তলবাবু।

ইন্দুমতী তেমনি চুপ করেই বসে রইল।

হয়ত সেদিন রাত্রে শুয়ে পড়লো কুন্তলবাবু। মাষ্টার আজ আসেনি, তবে মাষ্টার রাখবে স্থির করেছে মাত্র। কুন্তলবাবুর বুকটায় মুখ গুঁজে দেয় ইন্দুমতী। একটু পরে কুন্তলবাবু ওর মুখে হাত দিয়েই বুঝতে পারে ওর বড় বড় চোখের পাতা ভিজে।

একটু নরম হয়ে হয়ত বলে,—কান্নার কি হোল?

কথা না বলে মুখটা বুকে গুঁজে আরও কাঁদতে থাকে ইন্দুমতী।

—কি মুস্কিল, কি হোল?

কিছুক্ষণ পরে ইন্দুমতী ভিজে গলায় বলে,—আমি নাচ শিখতে পারব না।

তা না শিখলে, কিন্তু আমি যে এসব ভালবাসি। আমি যে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে এই সব আশা করেছিলাম' সেটাত বোঝো!

একটু ভাবতে ভাবতে ইন্দুমতীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কুন্তলবাবুর হাতে।

কুন্তলবাবু একটু অপ্রস্তুতে পড়ে বলে,—কি হোল, কাঁদছ কেন অত?

মৃদু স্বরে বলে ইন্দুমতী,—আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হওনি।

কুন্তলবাবু ইন্দুমতীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে একটু পরে ওর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলে,—সুখী যে হইনি ঠিক তা নয়। তোমাকে যে ভালবাসি একথা মিথ্যে নয়; কিন্তু আমার বাইরের কতকগুলো চাহিদা মেটাবার মত ধাত তোমার নয়, কিই বা করা যাবে তার জন্যে। সত্যিই আমি সুখী একদিকে, আর একদিকে অসুখী। তোমাকে ভালবাসি লক্ষ্মীর মত, কিন্তু উর্বশীও ত' চাই। সত্যিকারের পুরুষের জীবনে লক্ষ্মী উর্বশী দুই-ই যে প্রয়োজন, একথা এখন তোমাকে কি করে বোঝাই। দুটোই সত্যি। একটি আটপৌরে, একটি সৌখীন। টান কিন্তু আটপৌরের ওপরই বেশী। সৌখীনটা নেশার মত, আবার নেশা ছেড়ে দিতে পারলে চুকে যেতেও পারে।

খুব ধীরে ধীরে কথাগুলো বলছিলো কুন্তলবাবু। বড় বড় চোখ দুটো মেলে শুনছিলো ইন্দুমতী কিন্তু ভাবছিলো অন্য কথা। একটা ছেলেপুলে যদি হোত, তবে বোধ হয় এমন হোত না। একটি মোটে বাচ্চা মেয়ে কি ছেলে! ভগবান তাও তাকে দিলে না! উচ্ছৃঙ্খল যৌবন দিয়ে স্বামীকে বাঁধবার মত পটু নয় ইন্দুমতীর মন, সন্তানের স্নেহে হয়ত বা স্বামীকে আটকানো যেত। ভাবে ইন্দুমতী।

আস্তে আস্তে বলে,—একবার ডাক্তার দেখালে হয় না?

—কেন? অন্যমনস্ক ভাবেই কুন্তলবাবু বলে।

—যদি কোন অসুখ থেকে থাকে।

কুন্তলববে এবার বোঝে, হঠাৎ হেসে বলে,—পাগল নাকি! যতদিন না হয় ততদিনই ভাল।

ইন্দুমতী আহত হয়। কথা বল্লে না। মনে মনে মা লক্ষ্মীর কাছে হয়ত বা প্রার্থনা করে কিছু। কেই বা ওর মনের কথা জানবে!

এমনি করেই ত' চারটে বছর কাটল। বৈচিত্র বড় একটা ছিল না। শুধু মাস আষ্টেক আগে একদিন কুন্তলবাবু এসে বললে,—আজ বড় একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।

—কি ?—ইন্দুমতী শুধোল।

—হঠাৎ আজ অফিসে আমার ঘরে একটি ছেলে এসে হাজির। দরওয়ান ঘরে ঢুকতে দিচ্ছিল না, সে জোর করে ঢুকেছে। ইয়ংম্যান মানে চেহারা টেহারা বেশ। ঢুকে বলে,—আমাকে চাকরী দিতে হবে একটা। আমিত' অবাক। একটু রেগে বললাম,—কেন? ছেলেটি পরিষ্কার গলায় বললে,—আমার বাবা মারা গেছে, খেতে পাচ্ছি না তাই। চাকরী না দিয়ে এখান থেকে উঠছি না। মজা মন্দ নয় ত'! ছেলেটার গলার জোরটা কেমন যেন ভাল লাগল। এই বলে কুন্তলবাবু সিগারেট ধরালেন একটা।

ইন্দুমতী শুধোল,—তারপর কি করলে ?

ধোঁয়া ছেড়ে বলে কুন্তলবাবু,—কি আর কোরব। অফিসে ত' লোকের দরকার নেই। তাই আমার নিজের কাজের জন্যে নিলাম ওকে। কাল থেকে এই বাড়ীতেই থাকবে ওর মাকে নিয়ে। নীচ তলায় বাইরের দিকে ত' ঘর আছেই, সেখানে রাঁধবে, খাবে, থাকবে।

—বেশ ভাল করেছ।—ইন্দুমতী নিশ্বাস ফেলল একটা।

সিগারেট টানতে টানতে কুন্তলবাবু বলে,—ভাল কি খারাপ জানি না। তবে না দিয়ে উপায় ছিল না। তার গলার জোরটা যদি দেখতে! এই সব ছেলেই কিন্তু উন্নতি করে জীবনে। একে দেখে

আমারই আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। কি বিশ্বাস আর শক্তি ছিল মনে।

—এখনই বা কম কি!—ইন্দুমতী বলে।

কুন্তলবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, এখন যে আমি বড়লোক ইন্দু! তখন খেতে পেতাম না, বাইরে জোর ছিল না, বটে, কিন্তু ভেতরে যেন আগুন জ্বলতো—এত তেজ ছিল! আর এখন বাইরে জোর বেড়েছে কিন্তু ভেতরে বড় দুর্বল। ছেলেটিকে দেখে আজ যেন পরিষ্কার বুঝলাম কতটা দুর্বল হয়ে গেছি আমি নিজে।

সিগারেটটা ছাই দানীতে ফেলে গলার টাইটা আলগা করে দিয়ে কৌচে হেলান দিয়ে বসল কুন্তলবাবু।

—কফি করে আনব?—শুধোলো ইন্দুমতী।

—না, এখন থাক। একটু কাছে বোস।—ইন্দুমতী পাশে বসে।

কুন্তলবাবু কিছুক্ষণ চোখদুটো বুজে বসে থাকে।

মনের কোথায় যেন এক জমাট অসন্তোষের বোঝার ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এমন ক্লান্তি কুন্তলবাবুর মাঝে মাঝেই আসে। সব পেয়েও মাঝে একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে যেন কোথায়। হয়ত নিজের প্রাণশক্তিকে আত্মিক আনন্দে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি কুন্তলবাবু। প্রাণশক্তির নিদারুণ তেজে কর্মপ্রেরণায় ডুবে যেতে হয়েছে তবু। আত্মপ্রসাদ থেকে সে কর্ম-তেজ অনেক অনেক দূরে। মনটা শুধু প্রাণের তেজেই ফুটে উঠেছে। আত্মার আলো সে অন্ধ তেজের কিনারায়ও পৌছুতে পারেনি। তাই অসন্তোষের বোঝা বেড়েই চলে। কারো কাছে কিছুই পেলাম না মনে হয়। মনে হয় আরও চাই। যা পেয়েছি—একে পাওয়া বলে না। আরও ভরে

উঠুক আমার প্রাণ---পাত্র। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আজ তাই বলতে হয় কুন্তলবাবুকে,—তুমিও আমাকে ঠকালে ইন্দু!

ইন্দুমতী বিস্মিত হয় বই কি! স্বামীর যে কোথায় জ্বালা তার কিছুটা আন্দাজ ও করতে পারে। বলে,—কই, কখনও ত' মনে হয় না কাউকে ঠকিয়েছি!

কুন্তলবাবু বলে,—ভেবে দেখো। ভাল করে নিজের মনের ভেতর তাকিয়ে দেখো। তোমার সবটুকু তুমি আমার দাওনি ইন্দু। অনেক বাকী আছে, সেটুকু যে কার ঘরে জমা পড়বে জানিনে।

ইন্দু পাশে সরে এসে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে,—মন খারাপ কোর না। নিজের ওপর বিশ্বাস ফিরে আসুক তোমার। ভগবান জানে তোমাকে নিয়ে আমার কত ভাবনা।

—আমার জন্যে ভাবনা?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—তোমার চোখের রঙ বেশী, জিদ্ বেশী, সব কিছু জয় করবার লোভ বেশী, কেন জানো?

—কেন?

—তোমার টাকা আছে, তাই।

—আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়!

ইন্দুমতী সহসা কোন জবাব দিতে পারে না।

কিছুক্ষণ ভেবে মুখ নীচু করে বসে থাকে।

—জবাব নেই আমার কথার, কেমন?

ইন্দুমতীর মুখখানা শুকিয়ে যায়,—ঠিক বুঝিনে। মনে হয়, এ আমার টাকা নয়।

—আমি তোমার এত পর !

—ঠিক পর নয়। তুমি পর হতে যাবে কেন? তোমার টাকা আমার পর।. তুমিই আমাকে সে অধিকার কখনও দাওনি।

কুন্তলবাবুও আহত হয়,—তোমাকে অজস্র টাকা দিয়েছি খরচ করতে। তবু বললে কিছু দিইনি !

ইন্দুমতী তবু বলে,—ঠিক বোঝাতে পারছি নে তোমাকে। কি জান একটি গরীবের মেয়েকে জিদ করে বিয়ে করেছ, এ কথটা কিছুতেই আমায় ভুলতে দাও না।

—তুমিই ভুলতে পারো না বল !

ইন্দুমতী কুন্তলবাবুর চুলের ওপর হাত বোলাতে থাকে আর কথা বলে যায়। কথা কিই বা বলবে। যেখানে ও নিস্বঃ, সেখানেই কুন্তলবাবুর অমন জোর। সে জোর যে কতটা অন্যায় একথা স্বীকার করান সহজ নয়। কুন্তলবাবু স্বীকার করবে না কিছুতেই।

ইন্দুমতীই কি সব পেয়েছে ?

পেয়েছে, ও স্বামীকে প্রাণ ভরে ভালবাসতে পেরেছে। জীবনের একমাত্র পুরুষ বলে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পন করতে পেরেছে। তাইতেই ইন্দুমতীর তৃপ্তি।

আজ মাঝে মাঝে মনে হয়, এমন করে সব কিছু স্বামীর কাছে ঢেলে না দিলেই হয়ত ভাল হোত। আজ হয়ত তাহলে স্বামীর এই ক্ষোভ থাকত না। না চাইতে সবটুকু পেলে যেমন পাবার পূরো তৃপ্তি পাওয়া যায় না—তেমনি অবস্থাই হয়েছে আজ কুন্তলবাবুর। ইন্দুমতীর কাছে তার সব নারীত্ব টুকু পেতে যদি কুন্তলবাবুকে অনেক সাধনা করতে হোত, তাহলে কুন্তলবাবুর আজকের এই ক্ষোভ থাকত না।

তবু ইন্দুমতী ঠিকই করেছে। ওর বাবার কাছে শিখেছে ও স্বামীকে দেহ মন প্রাণ কিছু দিতে বাকী রাখতে নেই, বাবার শিক্ষার মর্যাদা ও রেখেছে। ও জানে ওর পরাজয় হবে না এতে। ধীরে ধীরে উঠে চলে যায় ইন্দুমতী কুন্তলবাবুকে একা রেখে।

পরদিন ছেলেটি মায়ের সঙ্গে আসে ওদের বাড়ীতে। ইন্দুমতীর আলাপ হয় প্রৌঢ়ার সঙ্গে। বাসা ছিল তাদের সহরের উপকণ্ঠে। স্বামী ছিলেন কেরাণী কোন এক সওদাগরী অফিসে। রোজগার নাকি করতেন প্রচুর। খরচ করতেন প্রচুর-তর। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশীর পুরো উদাহরণ ছিলেন তাঁর স্বামী। শুধু কি তাই! তিনি গহনা কিছু গড়ালেই স্বামীর নাকি রাতে ঘুম হোতো না, যতদিন না গহনাগুলো বিক্রি করে খরচ করতে পারতেন। কত রকমের ডালপালার সম্বন্ধ নিয়ে আত্মীয়রা এসে থাকতো তাঁর বাড়ী। বছরের পর বছর খেয়ে চাকরী যোগাড় করে টাকা জমিয়ে চলে গেছে, কত অসুখবিসুখে কত লোক সাহায্য নিয়েছে, তাতে স্বামীর নাকি ছিল মহা আনন্দ। কখনও কোন বাড়তি মানুষ সংসারে না থাকলে, সংসারে অভাব অনটন না হলে তাঁর নাকি ভাল লাগত না। বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগত। যেই অনেকগুলো লোক এসে গেল সংসারের ঘাড়ে, অমনি টাকা ধার করতে আর খরচ করতে তাঁর যেন ফুর্তি লেগে যেত।

—আর বলো কেন এমন না হলে আর ছেলেটাকে নিয়ে আজ পথে দাঁড়াই।

প্রৌঢ়ার চোখে জল দেখেও ইন্দুমতী বলে,—মানুষকে খাইয়ে পরিয়ে তিনি গেছেন, ভালই ত' করেছেন। দেখবেন আপনাদের কখনও অভাব হবে না।

—ঠিকই বলেছ মা।—প্রৌঢ়া চোখের জল মুছে বলেন, তিনিও

তাই বলতেন। যদি বলতাম, তুমি মরলে কোথায় দাঁড়াব, বলতেন ভগবান দেখবে। আমি জীবনে কোন অন্যায় করিনি যে তোমাদের অভাব হবে। বলতেন, বিশ্বাস করো, নির্ভর করো, উপায় হয়ে যাবে। এমন পাগল মানুষ!

ইন্দুমতী একটা নিশ্বাস ফেলে বলে,—তিনিই খাঁটি মানুষ ছিলেন মা।

—বড় সরল ছিলো।—প্রৌঢ়া বলে—মিথ্যে কথা মোটে বলতে পারত না। সংসারে থাকতে গেলে দু' একটা মিছে কথা কইলেই বা! কত রকম দরকার পড়ে। তা শুনলে রেগে বলতো,—মরে গেলেও মিথ্যে বলতে পারব না। এতে যা হয় হবে। ছেলেটাও হয়েছে তেমনি। একেবারে বাপের মত। বললুম বড় বড় মানুষের হাতে পায়ে ধরে একটা কাজ কর্ম জুটিয়ে নে। তা বলে,—হাতে পায়ে ধরতে পারব না। জোর করে কাজ নোব। দেখো তুমি! ওরে ও উদয়—

উদয়শেখর ঘর গোছাতে গোছাতে বেরিয়ে আসে,—কি মা!

—এই তোর দিদি!

উদয়শেখর ইন্দুমতীর দিকে তাকায়। ইন্দুমতী কপালের কাছে একটু ঘোমটা টেনে দেখে বড় বড় চোখ দুটো মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে উদয়।

ইন্দুমতী সে চোখে কোন সঙ্কোচের আভাষ না পেয়ে বলে,—আজ আমার ওখানেই তুমি আর তোমার মা খেয়ো ভাই!

ঘাড় নেড়ে উদয় ঘরের ভেতর চলে যায়।

ইন্দুমতী এবার তার নিজের কথা বলতে বসে। দেশ ময়মনসিংয়ে। সেখানে বুড়ো বাপ মাষ্টারী করে, একটি ছোট বোন আছে মাত্র। আর কাকারা আছেন। ছোট বোনটি এবার ক্লাস টেনে পড়ছে।

ম্যাট্রিক দেবে।

—আহা, মা নেই তোমার? শুধোয় প্রৌঢ়া।

—না, আমি যখন আট বছরের তখন মারা গেছেন। এদিকেও নেই কেউ। ওঁরও মা-বাপ মারা গিয়েছিলো ছোটবেলায়, মামার বাড়ী মানুষ হয়েছিলো।

আরও অনেক কথা হয়, শেষ পর্যন্ত রান্নার কালো জিরে পর্যন্তও কথা গড়ায়। মনের মত মানুষ পেয়ে গেছে ইন্দুমতী। সেদিন উদয়শেখর আর তার মা ইন্দুমতীর ঘরেই খায়। কুন্তলবাবু বাইরে ছিলেন, তিনি জানেনও না।

দিন কয়েক কেটে যায়। বাড়ীতে বসে যে সব চিঠিপত্র কুন্তল বাবুকে লিখতে হয়, সেগুলো লেখে উদয়শেখর আর ছোট মেসিনে টাইপ করে দেয়। সাংসারিক কিছু কিছু কাজও উদয়কে দিয়ে করাতে থাকে কুন্তলবাবু। বাড়ীতে সে বেশীর ভাগ সময়ই থাকে না, তাই উদয়কে পেয়ে বাড়ীর সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিন্ত কুন্তলবাবু।

উদয়শেখর কাজ করে বেশী, কথা বলে কম। একদিন শুধু ইন্দুমতীকে শুধিয়েছিলো ওর বড় বড় আলমারী ভর্তি বই দেখে;
—এ সব বই কি আপনার দিদি?

—হ্যাঁ, ভাই। তুমি পড়বে?—স্নিগ্ধ হেসে বলেছিলো ইন্দুমতী।

—দরকার হলে চেয়ে নিয়ে যাব।—বলে উদয়শেখর,—দিদি কি এসব বই পড়েছেন?

ইন্দুমতী হাসে—ও.হরি! তুমি বুঝি ভেবেছ তোমার দিদি খুব পড়ুয়া! কিছু পড়িনি। মুখ্যু বোলে আবার দিদি বলতে ঘেন্না করবে না ত'?

—লজ্জিত হয়ে হেসে উদয় বলে,—কি যে বলেন! পড়লেই

বুঝি খুব পণ্ডিত হয়।

—তোমাদের কুন্তলবাবু ত' তাই ভাবেন ভাই!

উদয় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়েই বলে,—ওটা ভুল দিদি। আমিও বেশী পড়িনি। বেশী পড়লে মানুষ গাধা হয়, আমার ত এই ধারণা।

—ঠিক বলেছ ভাই।—ইন্দুমতী ভারী খুসী,—কথাটা তোমার দাদাকে যদি একবার বোঝাতে পার, তবে সত্যি আমার বড় ভাল হয়। উদয় হেসে বলে,—রক্ষে করুন। ওঁকে দেখলে আমার কথা বন্ধ হয়ে যায়। ভয়ে নয়। ওটা আমার অভ্যেস। কারো কারো সঙ্গে আমি কথা বলতে পারিনে। তা ছাড়া বোঝান বড় শক্ত কাজ দিদি। নিজে না বুঝলে বোঝান যায় না।

ইন্দুমতী কথা পালটে বলে,—চা খাবে?

—না, এখন থাক।—বলে চলে যেতে চায় উদয়শেখর।

কুন্তলবাবুও ঘরে ঢোকে।

বলে ওঠে কুন্তলবাবু,—কিহে আমায় দেখে অমন পালাচ্ছ কেন?

উদয় দাঁড়িয়ে পড়ে।

ইন্দুমতী বলে ওর হয়ে,—তোমায় দেখে পালাতে যাবে কেন? তোমার যেমন কথা!

উদয় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কুন্তলবাবু বলে,—কি কথা হচ্ছিল তোমাদের?

—বইয়ের কথা।—বলে ইন্দুমতী,—উদয় বলছিল বই পড়ে কেউ বিদ্বান হয় না।

—তবে কি আকাশের দিকে তাকিয়ে বিদ্বান হয়?—কুন্তলবাবু বলে।

উদয় কথা বলে না।

—কিহে, কি মনে হয় তোমার?—এবার উদয়কেই শুধোয়

কুন্তলবাবু।

উদয় আস্তে আস্তে বলে,—উনি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারেননি। আমি বলছিলাম পড়লেই মানুষ জ্ঞানী হবে, এমন কথা বলাটা ঠিক হয় না।

—তবে কি অজ্ঞানী হয়?

—আজ্ঞে তাও ঠিক নয়। জ্ঞানের সঙ্গে বই পড়ার বিশেষ সম্পর্ক নেই।

কুন্তলবাবু ওর দৃঢ় প্রতিবাদে একটু বিব্রত হয়ে পড়ে, বলে,—তবে কিসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে?

উদয় একটু হেসে ধীর মৃদু কণ্ঠে বলে,—কথাটা বললে একটু হেঁয়ালী শোনাবে। জ্ঞানের সঙ্গে সত্য আর প্রেমের সম্পর্কই বেশী।

—হুঁ! প্রেমতত্ত্ব!—একটু যেন বাঁকা হেসে বলে কুন্তলবাবু।

ইন্দুমতী কুন্তলবাবুর এ ভাবটা ঠিক বুঝতে পারে না। কুন্তলবাবু কেন যে কোন সত্যিকারের ভালো মানুষকে পছন্দ করে না কে জানে। ইন্দুমতী যাকে পছন্দ করে, তাকে ত' কুন্তলবাবু পছন্দ করতেই পারে না। এমন কি কোন চাকর ইন্দুমতীর প্রিয় হলে কুন্তলবাবুর বিষ নজরে পড়ে সে। যেন একটা জ্বালাময় ঈর্ষার ভাব লক্ষ্য করে ইন্দুমতী কুন্তলবাবুর ভেতর। অথচ যাদের ইন্দুমতী পছন্দ করে না। তাদের সামনে বেরিয়ে গল্প করতে তাদের চা দিতে আপ্যায়ন করতে আদেশ করবে কুন্তলবাবু। এমনকি ধমকাবে পর্যন্ত। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে ইন্দুমতী কুন্তলবাবুর ব্যবহারে। ওর কাছে যেন হেঁয়ালী ঠেকে এ ব্যবহার। শুধু মনে হয় একটি ছেলে হলে বোধহয় আর এমন হোত না। উদয়ের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে ইন্দুমতীকে বলে কুন্তলবাবু,—প্রেমতত্ত্বের চর্চা বেশ ভাল। জ্ঞান বাড়বে,

কি বলো হে ছোকরা !

উদয় কথার ধরনটা বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে।

ইন্দুমতী চোখদুটোয় বিরক্তি এনে উদয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, —শুনলে ত' ভাই। বললুম তোমাকে !

উদয় হাসে।

কুন্তলবাবু বলে,—কি বলছিলে তুমি ?

—কিছু না। তুমি কি চা খাবে, না কফি খাবে ?

—কিছু না।—বলে কুন্তলবাবু।

উদয় এবার বলে,—তাহলে চললুম দিদি।

বলে উদয় বেরিয়ে যাবার সময় কুন্তলবাবুর দিকেও একবার তাকিয়ে বলে,—মায়ের আবার তাড়া আছে। যাই আমি।

কুন্তলবাবু কথা বলে না।

ইন্দুমতীও না।

এবার ইন্দুমতী বাইরে যায়। এককাপ কফি করে এনে দেয় কুন্তলবাবুকে।

কুন্তলবাবু কফি খেতে থাকে।

ইন্দুমতী বলে,—ওর সঙ্গে যে তর্ক করছিলে, ও কত পড়েছে জানো ?

—কত ?

—অনেক। ও নিজে ত' বই লেখে।

—তাই নাকি।—কুন্তলবাবু বিস্মিত হবার ভান করে।

—ভাল ভাল বই লেখে, নাটক নভেল।

কুন্তলবাবু মৃদু হেসে বলে,—তবে ত' প্রেমতত্ত্বে ওর অগাধ জ্ঞান।

ইন্দুমতী বলে,—তোমার কথার মানে ঠিক বুঝি না। আমার

ভয় হয় তোমার কথায় মাঝে মাঝে।

—হয় নাকি, তবু ভাগ্য।

ইন্দুমতীর চোখদুটো ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়। ওকে ক্লান্ত দেখায় যেন। ও নিজের সরল বুদ্ধিতে সহজভাবে কুন্তলবাবুর কোন কোন ব্যবহারের মানে খুঁজে পায় না।

বলে শুধু,—উদয়কে ওরকম বকলে কেন ?

—বকলুম। কই, নাত!—কুন্তলবাবু হাসে,—ও আমার চেয়ে কত বিদ্বান, ওকে বকব আমি! কি যে বলো!

ইন্দুমতী আর একটা কথাও বলে না। কফির কাপটা নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

দিনকতক কেটে যায়।

সেদিন রাত্রে খেতে বসে কুন্তলবাবু। ইন্দুমতী চিঁড়ের পোলাও করেছিলো আজ। ডিম সিদ্ধ করে টুকরো টুকরো কেটে কিসমিস বাদাম দিয়ে। কুন্তলবাবু খেতে বসে ওইটি মুখে দিয়ে বলে,—এটা কি রেঁধেছ ?

—বলো না !

—ভারী চমৎকার খেতে হয়েছে কিন্তু।

—চিঁড়ের পোলাও। খেয়েছ কখনও ?

—কোত্থেকে খাব। পঁচিশটা বছর হোটেলের ভাত খেয়ে কেটেছে। শুধু টাকার চিন্তাই করেছি। খাবার চিন্তা নিজেও করিনি, আর কেউ করবার ছিল না।

—আচ্ছা তখন কি খেতে হোটেলে ?—ইন্দুমতী ভারী খুসী হয়ে গল্প জুড়ে দেয়।

কুন্তলবাবু বলে,—কি আর, মাছ ভাত, মাংস পরোটা, দই—এই সব।

—হোটেলে কেমন রান্না হয়।

—মানে মাংসের ঝোল আর মাছের ঝোল খেতে একরকমই লাগে।

খিলখিল করে হাসতে থাকে ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবুও হাসে,—জানো না, একবার ছোট ছোট পুঁটির চচ্চড়ি হয়েছে। খানিকটা দিয়েছে। আমি আবার গুঁড়ো মাছ খুব পছন্দ করি কিনা। দু' তিনটে মাছ খেলুম ভারী সুন্দর লাগল। চতুর্থ

মাছটি মুখে দিয়ে কেমন যেন অন্যরকম লাগল। মুখ থেকে বার করে দেখি বেশ মোটাসোটা একটি আরশুলা।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবু বলে,—আজ আবার এই পোলাওয়ের ভেতর ছারপোকা-টোকা দাওনিত'।

ইন্দুমতী হেসে কুল পায় না।

অনেক হাসবার পর ইন্দুমতী বলে;—খেতে ত' ভাল হয়েছে। উদয় খেয়ে ত' আমার হাতখানা খেয়ে ফেলে আর কি। বলে, আপনার হাতটি নিশ্চয়ই মিষ্টি।

কুন্তলবাবু আর কথা বলে না।

খাওয়া সেরে শুতে যায় ওরা।

শুয়ে কুন্তলবাবু হঠাৎ শুধোয়,—আচ্ছা উদয় ছেলেটিকে তোমার কেমন মনে হয়?

—ছেলেটি বড় ভালো।

—কি করে বুঝলে? কুন্তলবাবুর নির্বিকার কণ্ঠ।

—কি পরিষ্কার বুদ্ধি! চমৎকার ছেলে!

—পছন্দ হয়েছে তাহলে! কুন্তলবাবুর গলার স্বরটা একটু অন্যরকম।

ইন্দুমতী কিন্তু বুঝতে পারে না, সরলভাবেই বললে,—ওর সঙ্গে যদি কথা বলো, দেখবে কি সুন্দর কথা বলে।

কাউকে ভাল লাগলে তার সবই সুন্দর মনে হয়।---বলে পাশ ফিরে ঘুমের ভান করে কুন্তলবাবু।

ইন্দুমতী দু' একবার ডাকে।

কুন্তলবাবু একটু কড়া গলায়ই বলে,—বিরক্ত কোর না। ঘুমোও।

ঘুম যে আসছে না।

—তবে যা খুসী করো।

একটু বিমর্ষ হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে ইন্দুমতী।

এরপর থেকে কুন্তলবাবুর ব্যবহারে বেশ একটা পরিবর্তন আসে যেন। ইন্দুমতী লক্ষ্য করে সেটা, তবু কারণ বোঝে না ভাল করে।

ভাবে হয়ত বা কাজ বেশী পড়েছে তাই মন খারাপ। আজকাল অনেক সময়ই কাজে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে কুন্তলবাবু। কোন বন্ধু বড় মানুষ কেউ আসবার কথা থাকলে বলে যায় চাকরকে। তাকে বসিয়ে রাখতে। অথবা চিঠি লিখে রেখে যায়। চিঠিটা তার হাতে দিয়ে দিতে বলে। ভুলেও আর ইন্দুমতীকে কিছু বলে না।

ইন্দুমতীকে বললে হয়ত সে বেঁকে বসত। কিন্তু না বলাতেও সে খুব খুসী হতে পারছে না। কিছু জোর না করা, কিছু না হুকুম করা। এ যেন কুন্তলবাবুর চরিত্রের বিরুদ্ধে। কুন্তলবাবুর ধমক খেয়েই অভ্যস্ত ইন্দুমতী। এমন ব্যবহার! এ যেন ভাবাই যায় না।

তবু ইন্দুমতী হয়ত একসময় বলে, আজ কি ফিরতে রাত হবে।

—হবে।—বেরোবার আগে বলে কুন্তলবাবু।

ইন্দুমতী কুন্তলবাবুকে রাগাবার জন্যেই হয়তবা বলে,----অত রাত কে তোমার জন্যে বসে থাকবে শুনি।

কুন্তলবাবু শুধু তাকায়। কথা বলে না।

ইন্দুমতী আবার বলে,—মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারো। অত রাত জেগে তোমার খাবার নিয়ে বসে থাকা আমার পোষাবে না।

কুন্তলবাবু বলে,—আমি খেয়েই আসব।

—কোথায় আবার খাবে।

—যেখানে যাচ্ছি, সেখানে।

—না, যেখানে সেখানে খেয়ে অসুখ করলে আবার কে দেখবে

তোমায় !—যতটা সম্ভব কড়া গলায় বলতে চায় ইন্দুমতী।

এবারেও উত্তর পাওয়া যায় না কুন্তলবাবুর কাছ থেকে।

—এখানে ওখানে খাওয়া হবে না।—আবার বলে ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবু গম্ভীর স্বরে বলে,—তবে খাবনা।

—সকাল সকাল ফিরবে ত' ?

কুন্তলবাবু এবার দৃঢ় স্বরে বলে,—না।

বলে বেরিয়ে যায়।

ইন্দুমতী হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। নিজের কপালটা খুঁড়তে ইচ্ছে হয়। এত দুর্ভোগ তার কপালে ছিল !

এত কথা বলবার পরেও একটু ধমকাল না। একটু রাগল না।

ইন্দুমতী কি করবে ভেবে পায় না।

কুন্তলবাবুকে আরও খোঁচা দিয়ে দেখেছে ইন্দুমতী।

এইত' সেদিন দুপুরে কুন্তলবাবু অপিসে বেরোচ্ছিল। ইন্দুমতী জানত কুন্তলবাবু উদয়কে আজকাল খুব ভাল চোখে দেখে না। তাই খোঁচা দেবার জন্যে বলে,—উদয়কে একটু ডেকে দেবে ওপরে।

কুন্তলবাবু তাকায়।

ইন্দুমতী বলে,—বেরোচ্ছ কিনা। অমনি যাবার সময়—

কুন্তলবাবু বলে,—আচ্ছা। ডেকে দিয়ে যাবো।

নিজের মনেই বলে ইন্দুমতী স্বামীকে শুনিয়ে শুনিয়ে,—আজ বইগুলো একটু গুছোব বসে ওর সঙ্গে। গল্প-সল্প করা যাবে। কথা না বলতে পেয়ে মরতে বসেছি। বাড়ীতে ত' আর মানুষ নেই যে দুটো কথা কই !

কুন্তলবাবু সব শোনে। একটা কথাও বলে না।

বেরোবার আগে ইন্দুমতী নিজেই আবার বলে,—থাক্ তোমার

ডাকবার দরকার নেই।

ব্যর্থ শরে সন্ধান করেছিল ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবু—আচ্ছা—বলে বেরিয়ে যায়।

ইন্দুমতী বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে।

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পরে বাইরের ঘরে গিয়ে গোটা কয়েক জরুরী চিঠি দেয় কুন্তলবাবু উদয়শেখরকে লিখতে টাইপ করতে।

উদয়শেখর টাইপ করে।

কুন্তলবাবু সিগারেট ধরায় একটা। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অকস্মাৎ বলে,—হ্যাঁ হে তুমি কি গল্প-টল্প লেখো।

হঠাৎ এ প্রশ্নে উদয়শেখর একটু অবাক হয়,—আপনি কি করে জানলেন ?

—ইন্দু বললে! ইন্দু ত' তোমার সব খবরই রাখে দেখি।—সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে কুন্তলবাবু।

উদয়শেখর কথা বলে না। এ কথার জবাব নেই, কাজেই আবার এক মনে টাইপ করতে থাকে।

বিকেলে ইন্দুমতী কুন্তলবাবুকে শুধোয়,—চা দোব ?

—না।

—কফি ?

—না।

ইন্দুমতী চলে যায় ভেতরে।

টেবিলের ওপর একখানি বাংলা বই নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটুকরো কাগজ চোখে পড়ে কুন্তলবাবুর—ইন্দুমতীর হাতের লেখা।—রাগ কোর না। তোমাকেই ভালবাসি।

কাগজের টুকরোটায় আরও অনেকবার চোখ বুলোয় কুন্তলবাবু।

তারপর পকেটে রেখে দেয়। ইতিমধ্যে একগ্লাস সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢোকে ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবু ইন্দুমতীকে শুধোয়,—এ বইটা এখানে কেন?

—উদয় নিয়ে গিয়েছিলো পড়তে, ফেরত দিয়ে গেছে।

কুন্তলবাবু আর কথা বলে না।

সরবতের গ্লাসটা সামনে এগিয়ে দেয় ইন্দুমতী। কুন্তলবাবু সেদিকে না তাকিয়েই ঘরের বাইরে চলে যায়।

সরবতের গ্লাসটা হাতে নিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দুমতী। কিছুই বুঝতে পারে না কেন এমন করছে কুন্তলবাবু।

ইতিমধ্যে উদয়শেখর ঘরে ঢোকে,—আর একখানা বই নিতে এসেছি দিদি।

ইন্দুমতী প্রথমে কথা বলে না।

—আর একখানা বই দিন না দিদি?

ইন্দুমতী হঠাৎ একটু কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে,—না, বই আর দিতে পারব না ভাই।

উদয় অবাক হয়ে যায় ইন্দুমতীর আকস্মিক রূঢ় ব্যবহারে।

কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। গ্লাস হাতে করে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দুমতী। ওর চোখ দুটো জ্বালা করতে করতে জলে ভরে ওঠে।

সেদিন রাত্রে শুতে গিয়ে ইন্দুমতী পরিষ্কার প্রশ্নই করে কুন্তল বাবুকে,—তুমি আমাকে এমন কোরে অপমান করছ কেন?

কুন্তলবাবু জবাব দেয় না যেন ইচ্ছে করেই।

—কারণ তোমাকে বলতে হবে। কেন আমাকে সব সময় অপমান করবে তুমি ?

কুন্তলবাবু যেন একটু মৃদু হাসে,—সম্মান জ্ঞানটাও তাহলে আছে দেখছি !

—মানে ?

মানে আমার অপমানে তোমার যে সম্মান বাড়ে কথাটা টের পাইনি।

—অপমানটা ত' একতরফাই হচ্ছে।

—ঠিকই। একতরফাই। আর একতরফ চুপ করে আছে এই মাত্র।

—চুপ করে থাকাটা কিছু বলার চেয়েও বেশী।

কুন্তলবাবু বলে,—তাছাড়া আর কি করতে পারি বলো ? যা চেয়েছিলাম, তা ত' পাইনি। মিছিমিছি তার জন্যে চেঁচিয়ে ত' লাভ নেই কিছু।

ইন্দুমতী আবেগপূর্ণ স্বরে বলে,—কিন্তু আমার দিকটা তুমি একেবারেই দেখছ না। আমিই যা চেয়েছিলাম তা কি পেয়েছি ? তবু আমি ত অভিমান করি নে। জানি যে সংসারে যতটুকু পাওয়া যায় তাই-ই অনেক, চাওয়াটা অত্যন্ত হ্যাংলাপনা।

কুন্তলবাবু চুপ করে থাকে।

—তুমি অমন কোর না। বলো আমি কি দোষ করেছি ? অনুনয়ের স্বরে বলে ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবু নির্বিকার কণ্ঠে বলে,—আমি ত' কিছুই করিনি ইন্দু। শুধু চুপ করে আছি মাত্র।

—তুমি চুপ করে থেকোনা। তুমি আগের মত কথা বলো আমার সঙ্গে।

—বলতে পারি, যদি আমার কথা শোন।

—শুনব···বলে ইন্দুমতী।

পরদিনই বললে কুন্তলবাবু,—মিঃ বাসু আজ আসবেন। আমি বেরোচ্ছি। তাকে চা দিয়ে গল্প করে বসিয়ে রাখবে।

ইন্দুমতীর বুক কাঁপে ওর সব বিরাট বপু-ওলা অফিসার ব্যবসাদার দেখলে, চোখে সজল মিনতি এনে বলে,—পারব না আমি। আমার বড় ভয় করে। সত্যি।

—পারতেই হবে।-----কুন্তলবাবু অপেক্ষা না করে বেরিয়ে যায়।

ইন্দুমতী বসে থাকে। দরজার শব্দ শুনে চমকে তাকিয়ে দেখে উদয়শেখর এসেছে। ইন্দুমতী ওকে ব্যস্ত হয়ে বলে,----ভাই, ওঁর এক বন্ধু আসবে কে মিষ্টার বাসু। তুমি একটু গল্প করে বসিয়ে রেখো ত' ভাই।

উদয় ঘাড় নেড়ে বলে,----আচ্ছা। কিন্তু—

—কিন্তু কি ভাই ?

উদয় হাসে,—আমার সঙ্গে কি তিনি কথা বলতে চাইবেন। দেখেই ওঁরা বুঝতে পারবেন আমি এখানকার চাকর। ওটা আমাদের মুখে ছাপ-মারা কিনা ?

—না, না, তা কখনও হয় !

—হয় দিদি, হয়। তুমি জানো না এমন অনেক ব্যাপার হয়।

হোলও তাই। ছ'ফিট লম্বা চওড়া এক জন লোক এলেন। খুজলেন কুন্তলবাবুকে। মিষ্টার বাসু ইনিই। রীমলেস চশমার ফাঁক দিয়ে দেখলেন উদয়কে।

উদয় বলল,—তিনি বেরিয়েছেন, এখুনি ফিরবেন। আপনি একটু বসুন বরং।

উদয়ের সঙ্গে এসে তিনি বসলেন ড্রইং-রুমে।

একটু পরে শুধোলেন,—মিসেস্ চৌধুরীকে একবার খবর দাও তুমি।

তুমি সম্বোধনেই উদয় বুঝল তার পরিচয় ধরা পড়ে গেছে। ভেতরে গিয়ে ইন্দুমতীকে বললো, তোমায় ডাকছে দিদি।

—বলো ভাই কাজে ব্যস্ত। আমি যেতে পারব না।

—এ তোমার বাড়াবাড়ি দিদি, একবার গেলেই বা!—উদয় বলে।

ইন্দুমতীর মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে,—না, ভাই রক্ষে করো। ওকে দেখেই আমার বুক কাঁপছে। মোষের মত কি চেহারারে বাবা!

অগত্যা উদয় ফিরে এসে বলে,—মিসেস্ চৌধুরী একটু বিজি। আপনি একটু বসুন।

মিষ্টার বাসু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে,—ও! আচ্ছা আমি চল্লুম, মিষ্টার চৌধুরী এলে বোল এসেছিলাম।

চলে গেলেন মিষ্টার বাসু।

ইন্দুমতীর মুখ শুকিয়ে গেল আরও।

এরপর কুন্তলবাবুর রাগারাগি করা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু কুন্তলবাবু একটুও রাগ করলো না। সব শুনে চুপ করে রইলো শুধু। একটু পরে পকেট থেকে একখানা টেলিগ্রাম বার করে বোলল,—অফিসের ঠিকানায় এসেছিলো। তোমার বাবার খুব অসুখ। বাঁচবেন কিনা সন্দেহ।

—তা হলে কি হবে!—ইন্দুমতী চোখে অন্ধকার দেখে।

কুন্তলবাবু শুধু বলে,—যা ভাল বোঝ করো। আমি আর কি বলবো!

বলে ঠিক আগের মতই নির্বিকার হয়ে বাইরে চলে যায় কুন্তলবাবু ইন্দুমতীকে একা রেখে।

সুগভীর চিন্তায় ডুবে যায় ইন্দুমতী। শৈশবে মা মরে যাওয়ার পরে বাবাই তাদের দু'বোনকে মানুষ করেছিলো। অতি নিরীহ স্কুল মাষ্টার। মাঝে মাঝে ছাত্র পড়ানো সম্ভব না হলে নিদারুণ দারিদ্র্য সহ্য করেও মেয়ে দুটিকে আগলে রেখেছিলো আড়ালে। দারিদ্র্যের আঁচ লাগতে দেয় নি তাদের গায়ে। ইন্দুমতীর যখন বিয়ে হোল, একমাত্র সেইদিনই ইন্দুমতী বাবার চোখে জল দেখেছিলো। কুন্তলবাবু বলেছিলেন, ইন্দুকে পাঠানো সম্ভব হবে না। প্রয়োজন হলে আপনি দেখতে আসতে পারেন। কিন্তু বাবা আসেনি। চিঠি দিয়েছে মাঝে মাঝে, কেমন থাকো জানিও। আর কিছু নয়। উত্তর দিয়েছে ইন্দুমতী, ভাল আছি। তোমরা কেমন আছো? ছোট বোন মধুমতীর চিঠিতে সে জেনেছিলো যে বাবা আজকাল কথা বলেন কম, রোগা হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। তবু ইন্দুমতী যেতে পারেনি বাবার কাছে। গেলে এখানে কে দেখবে! মধুমতী লিখেছিলো, বাবা আর আগের মত কড়া নেই দিদি, এখন আমি যেখানে খুসী বেড়াতে যেতে পারি, যখন খুসী ফিরতে পারি। ইন্দুমতী বুঝেছিলো যে বাবা হয়ত ভেবেছেন, একদিন ত' পরের ঘরে চলেই যাবে। দু দিনের জন্যে মিছিমিছি কড়া শাসন কোরে কিই বা লাভ!

মধুমতী ছোটবেলা থেকেই চঞ্চল, তাই ওকে মাঝে মাঝে ধমকাতেন। কিন্তু ইন্দুমতীকে জীবনে একদিনও বোধ করি কড়া কথা বলেননি। এ জন্যে ছোটবেলা থেকেই মধু ছেলেমানুষের মত বলত,—বাবা দিদিকে বেশী ভালবাসতেন।

হয়ত সত্যিই একটু বেশী ভালবাসতেন তিনি ইন্দুমতীকে। মাঝে মাঝে বলতেন, ও আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

আজ বাবার গুরুতর অসুখের সংবাদে কেমন করে বুক বাঁধবে

ইন্দুমতী। দু চোখ বেয়ে ওর জল গড়ায়। সমস্ত দুপুরটাই বসে বসে কাঁদে।

বিকেলে কুন্তলবাবু এসে শুধোল,—ঠিক করলে কিছু?

—তুমি আমাকে নিয়ে চলো।—ইন্দুমতী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে।

কি জানি কুন্তলবাবুর একটু মায়া লাগে। ইন্দুমতী কাঁদলে কুন্তলবাবু কোনদিনই সইতে পারে না। ইন্দুমতীর ওপর কুন্তলবাবুর ওই একটি দুর্বলতাই আছে। একে ভালবাসা বলা যায় কিনা কে জানে! এ কথা ইন্দুমতীও জানে না। তাই আজকের অশ্রুসজল অনুরোধও ব্যর্থ হোল না।

—কুন্তলবাবু বললো,—চলো। আজই চলো তবে সন্ধ্যের ট্রেনে। এদিককার সব না হয় উদয় আর তার মা দেখা শুনো করবে। শিগ্‌গিরি তৈরী হয়ে নাও।

ইন্দুমতী চোখ মুছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

ওরা যেদিন পৌঁছল, সেদিন ইন্দুর বাবার অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। দু' একজন স্কুলের ছাত্র এসে রাত জাগছিল, সেবা করছিল। বাড়ীতে ত' পুরুষ আর কেউ নেই। শুধু ইন্দুর ছোট বোন মধুমতী। মধুমতীর বয়স এখন আঠারো। স্বভাব চঞ্চলা মধুমতী ভয়ে শুকিয়ে বোবা হয়ে গেছে, দিদিকে দেখে জড়িয়ে ধরে মধুমতী,—তুই এসেচিস দিদি। বাবা বোধহয় বাঁচবে না।

—চুপ কর। অমন কথা বলতে নেই।—চোখের কোন দুটো সজল হয়ে উঠতে না উঠতেই ইন্দুমতী আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে।

—কে চিকিচ্ছে কচ্ছে।

—তারিণি ডাক্তার। ওই বিচ্ছিরি দেখতে।—মধুমতী ভরসা পায় যেন।

ইন্দুমতী কুন্তলবাবুকে বলে,—এখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো। আর আমাকে শ'তিনেক টাকা দাও।

ক্যাশবাক্সের চাবিটা ইন্দুর হাতে দিয়ে বলে কুন্তলবাবু—সাড়ে সাতশ' টাকা আছে। দরকার হলে আরও টাকা আনাব। কোন ত্রুটি যেন না হয়।

ইতিমধ্যে দুটি ছাত্র এসে ঢোকে বাড়ীতে।

মধুমতী বলে—বাবার ছাত্র। এরাই রাত জাগছে। সব করছে। আমার হাতপা অবশ হয়ে আসে। কিছু করতে পারি না।

কুন্তলবাবু একটি ছাত্রকে বলে,—ভালই হয়েছে। এখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে ডেকে আনতে পারবে ভাই।

—কেন পারব না। টাকা নেবে অনেক।

—তা নিক।—হাসে কুন্তলবাবু।

ছেলেটি বেরিয়ে যায়।

—অসুখটা কি ?

মধু বলে,—ডবল নিউমোনিয়া।

ইন্দু এবার বাবার ঘরের দিকে এগোয় চোখ মুছতে মুছতে।

মাস্টার শুয়েছিল প্রায় অজ্ঞান অবস্থায়। একটি ছাত্র বসেছিল শিয়রে।

ইন্দু গিয়ে বসল কাছে,—ডাকল,—বাবা!

মাস্টার চোখ মেলে তাকালেন একবার, বললেন,—তুই এলি মা। আর বাঁচব না।

ইন্দুমতী চোখের জল সামনে বলতে চায়,—ভয় নেই।

কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

—বিয়ের পর থেকে আমি পর হয়ে গেছি মা। একবারও এলিনে।

খুব ধীরে ধীরে বলেন মাস্টার।

ইন্দুমতী মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মোছে। কথা বলতে পারে না। কিই বা বলবার আছে, বাবা ত' জানে, কি মানুষের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার।

একদিন ইন্দুমতী না থাকলে কুন্তলবাবু চোখে অন্ধকার দেখে। অথচ ভাল যে কত বাসে তা ত' দেখতেই পাচ্ছে আজকাল।

কথা বলে না ইন্দুমতী।

ছেলেটির হাত থেকে পাখাটা নিয়ে বলে ইন্দুমতী,—তুমি যাও ভাই, এবার আমি বসি।

ছেলেটি চলে যায় না। পাশে বসে মুখে জল দেয়। ওষুধ দেয়।

কুন্তলবাবু একবার উঁকি দিয়ে দেখে ঘরের ভেতর। ভেতরে আর ঢোকে না। শ্বশুরের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ ছিল না। আজ মৃত্যুর আগে আর তার সঙ্গে পরিচয় করে কিই বা লাভ।

মধু ঘরে আসতে বলে ইন্দুমতী,—ওনার কি লাগবে না লাগবে ছাখ। চা করে দে, স্নানের জল দে।

মধুমতী বোঝে কুন্তলবাবু এ বাড়ীর জামাই, তার আপ্যায়নের ভারটা মধুর ওপর দিয়ে ইন্দুমতী বাবার সেবায় দিনরাত কাটাতে চায়।

মধুমতীও যেন বেঁচে যায়। ওর ভাল লাগছিল না অসুখের আবহাওয়া। এখন একটু হাঁপ ছাড়তে পারবে। তাছাড়া রোগীর সেবা করবার মত ধৈর্য নেই মধুমতীর। কিছুক্ষণ বাতাস করলেই হাত ধরে আসে। রাত্রে জেগে থাকবার খুব চেষ্টা করলেও চোখ যেন জোর করে কে টেনে দেয়। ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে অর্ধেক গলায় পড়ে, অর্ধেক জামায়। তাড়াহুড়ো ছট্‌ফট্ করা স্বভাব ওর, ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকতে বললেই ওর কান্না পায়।

ইন্দুমতী দু মাস এক ভাবে যে কোন রোগীর সেবা করে যেতে পারে। রাতের পর রাত জেগে থাকতে পারে অতি ধীর ভাবে। তার জন্মে কোন দিন কোন অভিযোগও করবে না কারো কাছে ইন্দুমতী। ওর যেন ভালই লাগে এসব করতে।

মধুমতী বেঁচে যায় তাই। বাইরে এসে বলে কুন্তলবাবুকে,—চলুন, জামা জুতো ছেড়ে একটু চা খেয়ে নিন।

বাইরের ঘরে কুন্তলবাবুকে বসিয়ে মধুমতী চা করতে যায়।

চা দিয়ে গল্প করে। নানা গল্প, শুধু অসুখের গল্প বাদে।

—বিয়ের পর কি একবারও আসতে নেই। শুধু দিদিকেই চিনলেন, আর কাউকে চিনলেন না।—চিঠিও ত' দিতেন না হয় একখানা।

দিদির জন্তে কত দরদ! পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস নেই।

—আপনি কিন্তু বিয়ের সময় যেমন ছিলেন, তেমন নেই। বেশ মোটা হয়ে গেছেন। তবে মানিয়েছে ভারী সুন্দর।

—আমি? আমার কথা ছেড়ে দিন। আমরা বাঁচলে মরলেই বা কে খোঁজ করছে।

খই ফুটে যায় মধুমতীর মুখে। কুন্তলবাবুর নাওয়া খাওয়া থেকে সুরু করে বিছানা পাতা, গল্প করা, হাওয়া করা সব মধুমতী।

ইন্দুমতী এদিকে আসতেই পারে না। একবার স্নান করে খেয়ে যায় দুটি খানি। দিনরাত ওষুধ ডাক্তার, রাতজাগা, পথ্য—এই নিয়েই কাটে।

কয়েকদিনে ইন্দুমতীর মুখখানা ম্লান হয়ে আসে, শরীর শুকিয়ে আসে। এত করবার পরও ডাক্তাররা আশা দেন না। বলেন আরও এক সপ্তাহ না গেলে কিছু বলা যাবে না।

কুন্তলবাবু হয়ত বা দেখতে আস এক-আধবার। মধুমতীও এক

আধবারই আসে। একটু অভিযোগ করেই হয়ত বলে ইন্দুমতী,—দু দণ্ড কি বসতেও পারিস নে বাবার কাছে!

—কি করে বসি বলো!—মধুমতী বলে,—ওদিকের সবই ত' করতে হচ্ছে আমায়। রান্না, দেয়া থোয়া, এতেই ত' জীবন বেরোবার জোগাড়।

—কি রান্নাই বা করিস, তিনটি ত' মানুষ। কি এত রান্না শুনি!

মধুমতী একটু চটে,—তোমার বরকে একটু ভাল করে খেতে না দিলে তোমারই ত' রাগ হবে।

মধুমতীর অকারণ মন চাঞ্চল্যে ইন্দুমতী গম্ভীর হয়ে বলে,—বাজে কথা বলিসনি মধু। এ আমার রাগ করবার সময় নয়। তোরও রাগ করবার সময় নয়।

—রাগ আর কার ওপর কোরব।—ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে চলে যায় মধুমতী।

দুপুরে একটি ছাত্রকে বাবার কাছে বসিয়ে খেতে যায় ইন্দুমতী, মধুকে বলে,—খেয়েছিস্?

মধুমতী কথা বলে না। ভ্রূ দুটো ধনুকের মত কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকে।

—কিরে খেয়েছিস। না-খেয়ে থাকিস ত' তোর ভাতও নিয়ে বোস।

—আমার খিদে নেই।

ইন্দু হেসে বলে—তুই এখনও ছেলেমানুষই রইলি মধু। এ সময়ে কি রাগ করতে আছে। আচ্ছা না হয় আমারই অন্যায় হয়েছে। আয়। বড় বলে একটু কি বকতেও পারি না।

মধুমতীর চোখদুটো টস্ টস্ করে জলে।

—ওমা, এই দেখো, কি ছেলেমানুষরে! কাঁদচিস কেন? আয় খাবি আয়।

ইন্দুমতী ওর হাত ধরে টানে।

মধুমতী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—না ছাড়ো, আমার খিদে নেই। ছাড়ো।

—আয় আজ এক পাতে বসে খাব আমরা। আয়, লক্ষ্মী বোন আয়।

মধুমতী তবু আসে না। কিছুতেই না।

অনেক সাধাসাধিতেও যখন আসে না। তখন ইন্দুমতী যায় বাইরের ঘরে বলে কুন্তলবাবুকে, মধুর রাগ হয়েছে। সকালে একটু বকেচি তাই। দেখোত' খাওয়াতে পারো কিনা, আমার কথায় কিছুতেই খাবে না। তোমার কথায় যদি খায় দেখো। আমার আর সাধবার সময় নেই। বাবার কাছে যেতে হবে।

কুন্তলবাবু পান চিবোতে চিবোতে বেশ আরাম করে সিগারেট টানছিলেন। মধুমতী খায়নি শুনে উঠতে হয় তাকে।

গিয়ে বলে মধুকে,—কই গো ছোট বউ খেয়ে নাও।

—খবদ্দার আপনি ছোট বউ বলবেন না।—মধু চটে যায়।

কুন্তলবাবু খুব হাসতে থাকে।

—না খেলে কিন্তু সকলের সামনে বোলব, খেয়ে নাও শিগগির। বড় বউকে বকে দোব আমি, নাও হোল ত! খেয়ে নাও।

মধু তবু খাবে না।

—তবে কিন্তু আমি কালই চলে যাব।

কুন্তলবাবুর অনুরোধেই শেষপর্যন্ত মধুমতীকে ভাত খেতে হয়।

কুন্তলবাবু হাসতে হাসতে বলে ইন্দুমতীর দিকে তাকিয়ে,—দেখলে, মধু তোমার চেয়ে আমায় কত বেশী ভালবাসে!

ইন্দুমতী হাসতে থাকে। তবু মধুর আজকের ব্যবহার ওর অত্যন্ত খারাপ লাগে। বড় বোনকে এমন করে অপমান করাটা ঠিক কাজ

নয়। বেশী আদরে মধুর কাণ্ডজ্ঞানও চলে গেছে। এই বিপদের সময় অত বড় মেয়ে অমন রাগ করে বসল! একটু লজ্জাও হোল না। ইন্দুমতী নিজেও যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে।

শুধু ভারী খুসী কুন্তলবাবু।

মধুমতী বলে সন্ধ্যেবেলা কুন্তলবাবুকে,—সত্যি দিদি এমন ঘা' দিয়ে কথা বলে!

কুন্তলবাবু হাসতে হাসতে বলে,—তোমার দিদির ওই ত' স্বভাব, কি বলেছে শুনি?

—বলে কেন আমি বাবার কাছে দুদণ্ড বসি না। বসবার আমার সময় কই বলুন, রান্না করে কাজ করে সব সেরে সময় কখন পাই যে যাব বাবার কাছে। নইলে বাবা কি তার একার, আমার না!

—বটেই ত!

—তাছাড়া দিদি আছে তাই আমি নিশ্চিন্ত থাকি। দিদি সেটা বোঝে না। চিরকালই দিদি দেখতে পারে না আমায় দু চোখে।

তাই নাকি!—হাসতে হাসতে বলে কুন্তলবাবু।

—জানেন না বুঝি। ছোটবেলায় কি শাসনটাই কোরত। কোথায় বেড়াতে গিয়ে দেরি হলে, কেন দেরি হোল কৈফিয়ত দিতে হবে, পাতা কেটে চুল বাঁধলে, চুল খুলে আবার পিছন টেনে চিপলি খোঁপা করে দিত। ভাল কথায় কথা না বললে আড়ালে ডেকে ধমকাত। সবসময় ও আমার পেছনে লেগে থাকত। বিয়ে হয়ে গেল না বাঁচলুম।

—যা বলেছ! বিয়ের পর থেকে তোমাকে ছেড়ে এখন আবার আমার পিছনে লেগে আছে। রাতে কোথায় গিয়েছিলে, কোথায় নেমন্তন্ন খেলে, কার কার বাড়ী খেলে আজ। কৈফিয়ত দিতে দিতে

হয়রান। কি আর করা যাবে! ছেড়ে দেয়াই ভাল।

কমলা কোয়ার মত ঠোঁট ফুলিয়ে মধুমতী বলে,—বয়ে গেল আমার, যা বলবি বল না। বাবা ভাল হয়ে উঠলে আর ত' বলতে আসবি না।

—যা বলেচ! একটা চীৎকার শুনলুম যেন!

—তাই ত'। কি হোল!

ইন্দুমতীর কান্নার শব্দে ওরা দুজন ছুটে যায়। গিয়ে দেখে বাবার বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ইন্দুমতী।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুন্তলবাবু।

ইন্দুমতী—বাবা গো!—বলে কাঁদতে কাঁদতে বাবার পায়ের ওপর পড়ে।

ছাত্ররা একে একে এসে জোটে। পড়শী রাও জোটে।

নানাজন নানাকথা বলে,—কেঁদে আর কি লাভ। যা হবার ত' হয়ে গেছে।

কেউ বলে,—কাঁদুক। কাঁদতে দাও।

কেউ বা বলে,—মানুষ মাত্রেই ত' মরবে। মিছিমিছি শোক করে কষ্ট বাড়ে ছাড়া কমে না।

ওদের ধরে ওঠায় বউ ঝিরা।

ছাত্ররা সব বাইরে নিয়ে আসে।

মধুমতী জড়িয়ে ধরে ইন্দুকে,—দিদিগো। আমার কি হবে। কি করবো আমি।

ইন্দুও বোনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

ওরই ভেতর বোনের চোখের জল মুছিয়ে দেয়,—কাঁদিসনে মধু।

—আমি কি কোরব দিদি।

ইন্দু ওকে কোলের ওপর নিয়ে ছোট মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার মত

করে বলে,—কি আর করবি। আমি ত' আছি। ভয় কি তোর।

দিদির অভয় পেয়ে দিদির কোলে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে মধুমতী। এক মুহূর্ত আগেই যে দিদির ওপর রাগে ফেটে পড়ছিল, সেই দিদিকেই এখন জীবনের একমাত্র ভরসা বলে জড়িয়ে ধরেছে মধুমতী।

সংসারটা বড়ই বিচিত্র! মনে মনে না হেসে পারে না কুন্তলবাবু।

কুন্তলবাবু আরও দু'চার দিন রয়ে গেলো। শেষকৃত্য সমাপ্ত করে—কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যে প্রস্তুত হোল ওরা।

ইন্দুমতী একবার শুধিয়েছিলো,—মধু এখন কোথায় থাকবে?

কুন্তলবাবু বললো,—কোথায় আবার! আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবে। ওখানে তোমার কাছে থাকবে পড়াশুনো করবে। তুমি কি ওকে এখানে থেকে যেতে বলো না কি!

ইন্দুমতী আনন্দে মুখ ভরে হাসে,—আমারও ত' ইচ্ছে আমার সঙ্গে চলুক, কিন্তু তোমার মত না হলে—।

কুন্তলবাবু আহত হন,—এতে আবার মত-অমত কি! তুমি কি আমাকে জন্তু জানোয়ার মনে করো! একটা মেয়েকে একা ফেলে রেখে পালাব!

ইন্দুমতী বলে,—ছি, ছি, কি যাতা' বলছ! আমি জানি তুমি তা' পারো না। তবু স্বামীর অনুমতি নেয়া আমার কর্ত্তব্য—তাই।

মধুমতীও ওদের সঙ্গে কলকাতায় রওনা হোল।

ইন্দুমতী আর মধুমতী—যেন উত্তরমেরু আর দক্ষিনমেরু,—রাত্রি আর দিন। ইন্দুমতী যেমন ঠাণ্ডা, মধুমতী তেমন গরম, ইন্দুমতী যেমন স্থিরা, মধুমতী তেমনি চঞ্চলা, ইন্দুমতীর ব্যবহারে কথায় যেমন সুস্পষ্ট সংযম, মধুমতীর তেমনি অনর্থক অসংযম। ইন্দুমতী মধুকে এত ভালবাসে, মধুমতী ভালবাসার ধার ধারেনা। তবু জানে তার দিদি আছে, এই মাত্র।

পিতৃবিয়োগের শোকের বেগটা কমতে কমতেই ষ্টিমারে ট্রেনে

মধুমতী যেন পূর্ণভাবে প্রকাশ পেল। ইন্দুর চেয়ে বিঘত খানেক লম্বা, অনেক ফাঁপালো দেহখানা। নীচের ঠোঁটটা মোটা একটু, ফুলো কমলালেবুর কোয়ার মত। চোখদুটো বড় বড় কিন্তু সবসময়ে নড়তে থাকে এদিক ওদিক ভাবোচ্ছ্বাসে। হাসতে পারে অফুরন্ত আওয়াজ কোরে কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গার মত। স্বর একটু মোটা, কিন্তু মিষ্টি দরদে ভরা। খোঁপা বাঁধলে খুলে যায় অনবরত, মাংসল হাত দুটো তুলে খোঁপা আবার জড়াতে থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় জনকয়েক পুরুষের চোখ আঠার মত লেপ্‌টে থাকে মধুমতীর গায়ে গায়ে। ইন্দুমতী জড়সড় হয়ে বসে থাকে একটা বোঁচকার মত সকলের আড়ালে। মাঝে মাঝে মধু যখন কুন্তলবাবুর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা চুরি করে নিয়ে অনর্থক গা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে থাকে। ইন্দুমতী ফিস্ ফিস্ করে তর্জন করে।—হচ্ছে কি! অসভ্য!

—তুই থাম দিদি!...পালটা জবাব দিয়ে আরও হাসে মধুমতী। কুন্তলবাবুর দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে,—দিদিটা একেবারে আইস্‌ক্রীম, না সায়েব বাবু!

কুন্তলবাবুকে মধু সায়েববাবু বলেই ডাকত, তার কারণ বিয়েব সময়টুকু ছাড়া আর সবসময়ই কুন্তলবাবু কোট পাত্‌লুন পরে থাকত।

মধুর এ কথার জবাবে কুন্তলবাবু হাসে, বলে,—আইস্‌ক্রীম কিন্তু ওপরে ঠাণ্ডা, খেলে পেট গরম হয়।

ইন্দুমতী কথাটা ভাল করে শোনেনি, না বুঝে বোকার মত হাসে।

মধুমতী আরও হেসে বলে,—দিদি হাসলি যে, তুই [illegible] বল্ তবু ত' খাবার সাধ যায় না!

ইন্দু শুধু বলে,—কি বক্‌তে পারিস মধু!

—দেখনা সাহেববাবুকে দুদিনে জব্দ করে দোব। তোকে ভাল-মানুষ পেয়ে খুব বোধ হয় পেয়ে বসেছে !

ইন্দুমতী আবার বলে,—চুপ কর বাপু !

কিন্তু চুপ করা মধুমতীর ধাত নয়। ট্রেনে সমস্ত সময়টা এইভাবে কাটায় মধুমতী। একটু ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই। অফুরন্ত যৌবন যেন !

বাড়ীতে ঢুকে ভ্যানিটি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ওঠে মধুমতী। ইন্দুমতী তার পিছনে, তার পিছনে কুন্তলবাবু। ওপর থেকে উদয় নামছিল। তাচ্ছিল্য ভরে একবার তাকায় মধুমতী। উদয় তার দিকে না তাকিয়ে নেমে যায় একপাশ দিয়ে। মধুমতীর রাগ হয় একটু। তারদিকে একটু না তাকিয়ে যে কোন যুবক চলে যেতে পারে এ যেন বিশ্বাস করাই যায় না। উদয় নীচে নামবার আগেই মধুমতী বলে—এ ছোঁড়াটা কে দিদি ?

ইন্দুমতী 'ছোঁড়াটা' বলায় একটু ধমকে বলে,—ছি ! মধু ! কথা বলতেও জান না ! কুন্তলবাবু একটা কথাও বলে না।

সেদিন দুপুরে কাজ সেরে উদয় একবার এলো ওপরে ইন্দুমতীর কাছে। দেখা করতে। ইন্দুমতী কাপড় জামা তুলছিলো আলমারীতে। উদয় ঘরে ঢুকতেই বলে,—এসো ভাই, বোসো তোমাদের ঘরে যাবার একটু সময়ও পাইনি ! এসে আমি এত কাজে পড়েছি !

উদয় না বসে একটু হেসে বলে,—শরীর ভালো আছে ত' ?

—শরীর একরকম আছে ! আমার বোনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার ? মধুমতী খবরের কাগজে প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে বসেছিলো এক কোণে।

—ওই আমার বোন।—আঙ্গুল দিয়ে দেখায় ইন্দুমতী।

উদয় তাকিয়ে দেখে কৌচের ওপর খবরের কাগজ!

মধুমতী খবরের কাগজটা নামিয়ে নমস্কার করে। উদয়ও প্রতিনমস্কার জানায় মাত্র। মধুমতী জানত যে উদয় কাজ করে কুন্তলবাবুর কাছে। তাই ওকে একটু বিব্রত করবার জন্যই হয়ত' বা প্রশ্ন করে,—আপনি কোথায় থাকেন, কি করেন?

উদয় উত্তর দেবার আগেই ইন্দুমতী উত্তর দেয়,—থাকে ওর দিদির কাছে, আমার বাড়ীতে। আর উদয় খুব ভাল গল্প লিখতে পারে জানিস মধু?

অ! কবি!—ঠোঁট উলটিয়ে বলে মধু।

উদয় খুব ধীরে ধীরে সামান্য হেসে বলে,—গল্প লিখলে কি তাকে কবি বলে, তাহলে ত' শিং না থেকে খোঁপা থাকলেও তাকে গরু বলা যেত। কি বলো দিদি!

ইন্দু কাপড় গোছাতে গোছাতে একটু হাসে মাত্র।

মধুমতী জ্বলে যায়,—বলে ইন্দুর দিকে তাকিয়ে,—শুনেছিলাম দিদি যে একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে বাড়ীতে রেখেছে, সে ছেলেটা কই। আমার চুলের ফিতে কাঁটা এগুলো আনতে দিতুম। তোমরা কি কাজ না করিয়ে মাইনে দাও নাকি?

উদয় তবু হাসে,—সেই ছেলেটি আমিই। ধরেছেন ঠিক। তবে ফিতে কাঁটা আনতে রাজী নই বাঁধবার মত চুল না থাকলে।

সত্যিই মধুমতীর চুল খাটো করে ছাঁটা, মেমদের মত অনেকটা। ঘাড় অবধি।

ইন্দুমতী অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ে ওদের কথার রকম দেখে, বলে,—ঠিক বলেছ ভাই। চুল নেই তার ফিতে কাঁটা! তাছাড়া ওকি চাকর নাকি! ও লেখাপড়ার কাজ করে শুধু।

—সেটাও চাকরী দিদি !—উদয় বলে।

মধুমতীর স্বরূপ প্রকাশ পায়, নির্লজ্জ সরলতা। ও যেন ফণা ধরে বলে সরাসরি উদয়কে,—কি পাস করেছেন আপনি? দিদি যে অত লেখাপড়া লেখাপড়া কচ্ছে?

উদয় একটু বিস্মিত হয় ওর প্রশ্নের রূঢ়তায়, মেয়েটার কি মাথার ছিট আছে !

উদয় মধুর দিকে না তাকিয়েই ইন্দুমতীকে বলে,—দিদি আপনার একটা কাঁচের গ্লাস ভেঙ্গেছি। সেই কথাটাই বলতে এসেছিলাম।

ইন্দুমতী হাসে,—এ আবার বলবার কি আছে! তুমি আমার সঙ্গে যদি কাল দুপুরে বইগুলো একটু গুছিয়ে দিতে ভাই, বড় ভাল হোত! সেই যে তুমি বলেছিলে একধরনের বই এক এক তাকে রাখলে ভাল হয় !

উদয় বলে,—আচ্ছা, দেখি, যদি কাল সময় পাই আসব !

চলে যেতে চায়।

মধুমতী সটান উদয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। সকাল থেকে এর তাচ্ছিল্যের ভাবটা মধুর সবচেয়ে খারাপ লেগেছে। সামান্য একটা ছেলে! ময়মনসিং-য়ের জাঁহাবাজ মেয়ে মধুমতী যাকে দেখে কলেজের ছেলেগুলো তোত্‌লা হয়ে যেত, তার কাছে এত বড় স্পর্দ্ধা! দরকার হলে ছফিট্ লম্বা দোহারা কলেজের ছেলেকে সে এক একটা চড়ও যে কসায়নি তা নয়। তার সঙ্গে চালাকি !

সামনে এসে বলে,—এই আমার কথার জবাব দিলেন না যে !

—আমার খুশী !—ধীর ও দৃঢ় কণ্ঠে জবাব আসে উদয়ের কাছ থেকে।

থ' হয়ে যায়, মধুমতী। আচ্ছা! দাঁড়াও !

উদয় চলে গেছে ততক্ষণ। মধু ইন্দুর কাছে আসে। কাছে আসতেই ইন্দুমতী বলে,—বড় বেহায়া হয়েছিস মধু!

মধুমতী সে কথার জবাব না দিয়ে বলে,—চাকর বাকরদের বড় বাড়িয়ে তুলেছ দিদি, আমি এসে অবধি দেখছি, কেউ তোমাকে মানে না।

ইন্দুমতী আবার বলে,—ওকে কক্ষনো চাকর বলো না মধু! ভদ্রলোকের ছেলে নেহাৎ অভাবে পড়েই এসেছে বইত' নয়।

—ও! কি দরদ! দুদিনে আমি সায়েব বাবুকে বলে টিট্ করে দোব সব।

ইন্দু হাসে,—তোর সাবেব বাবুও ত' তাই-ই চায় রে! আমার জন্যই পারে না!

মধুমতী বলে,—আমি পষ্ট বলে দিচ্ছি। তোমার ও ভালমানষি চলবে না।

—বাবা! তুই এত রাগলি কেন লো!

—রাগব না। কথার জবাব না দিয়ে চলে যায় এত বড় আস্পর্দ্ধা।

—না রে না। ও বড় ভাল ছেলে। এমনিতে অবিশ্যি কাউকে তোয়াক্কা করে না। তোর সায়েব বাবুকেও না।

—আচ্ছা, দেখব কেমন তোয়াক্কা না করে।—মধুমতী ওঘরে চলে যায়।

বেথুনে ভর্তি হোল মধুমতী। গানের মাষ্টার ঠিক হোল। পড়বার ঘর ঠিক হোল, শোবার ঘর ঠিক হোল। বাজারে কুন্তলবাবু নিজে ওকে নিয়ে বেরোলো, নিয়ে এলো প্রচুর সাড়ী, জামা আর প্রসাধনী। মাজা ঘষায় সাজে সজ্জায় মধুমতী যেন উপচে পড়লো! কুন্তলবাবু কথা বললো না বেশী, শুধু মধুমতীর টলমল ভাবটা চোখ চেয়ে দেখছে

লাগল শুধু।

সেদিন সন্ধ্যায় একটি মদ্রদেশীয় ভদ্রলোককে এনে বললো,—এর নাম মেনন। নাচ শেখাবে। মধুকে।

সামান্য কিছু কিছু নাচ ময়মনসিং-য়ে থাকতে শিখেছিলো মধুমতী। ও যেন স্বর্গ হাতে পেল।

—থ্রী চিয়ার্স ফর সায়েব বাবু!

কুন্তলবাবু ওর দিকে তাকিয়ে রইল শুধু, যেমন তাকিয়ে থাকে কোন ভাস্কর নিজে হাতে তৈরী করতে করতে পুতুলের দিকে।

—দৈহিক গঠন আর মানসিক স্ফূর্তি নৃত্যের খুব উপযোগী। মেনন সাটিফাই করলো।

কুন্তলবাবু জবাব দিলো না কোন, একটা সিগারেট ধরালো শুধু।

মধুমতীর নৃত্যের শিক্ষা শুরু হোল মেননের কাছে। কথাটা ইন্দুমতী শুনলো একদিন পরে। ইদানীং সন্ধ্যায় ইন্দুমতী একা একাই থাকত। মধুমতীকে নিয়ে কুন্তলবাবু প্রায়ই বেরোত কোন পার্টিতে বা কোথাও বেড়াতে বা কোন বান্ধবের বাড়ী। প্রথম প্রথম মধুমতী এসে গল্প কোরত,---উঃ! কি ভীষণ!

—ভীষণ আবার কিরে?

ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে মধু বোলত,—সায়েব বাবুর এক বন্ধুর বাড়ী গেলুম। কি বাড়ী! আর ছেলে মেয়েরা সব যেন টুক্ টুক্ করছে রঙ আর কি সুন্দর! কি চমৎকার কথা বলে! তুই একেবারে বোকা দিদি! তুই যেতে চাস না কেন?

কোনদিন হয়ত বা বলে,—বাব্বা! মেমসায়েবের হোটেল! তা আমায় ঠকাতে পারেনি; সব বন্ধুদের—সায়েব বন্ধুদের সঙ্গেও হেসে কথা বললুম। কি খুসী তারা! একেবারে ড্যাম্ গ্ল্যাড্। ইয়েস্

নো করে চালালুম আজ। সায়েববাবু বলেছে—একটা মেম রেখে দেবে ইংরেজী শেখাতে!

একটা সায়েব আমার পাশে বসে কি খুসী। বাঙালী মেয়ের গায়ের ছোঁয়া যেন স্বর্গ! কি হ্যাংলা! মাগো! সে আবার সায়েব-বাবুকে নাকি বলেছে, আমায় মুক্তোর নেকলেস প্রেজেণ্ট করবে একটা। শুধু তাই নয়, সায়েব বাবুরও একটা স্যালভেজ লেগে গেল আমার ওপর নজর পড়ে।

স্থির হয়ে সব শোনে ইন্দুমতী। কোনদিন হুঁ—হ্যাঁ—করে। কোনদিন বা করে না। হয়ত বা কোন সন্ধ্যায় যেদিন বেরোত না, বন্ধুরা আসত ড্রইংরুমে, কুন্তলবাবুও থাকত। মধুমতী হয়ত দিদির কাছে বসে সেলাই করছিল। ডেকে পাঠায় কুন্তলবাবু।

—কাকে, দিদিকে? মধু শুধোয়।

ইন্দুমতী বলে,—ও বাবা! আমি যেতে পারব না!

চাকর বলে,—আপনাকে ডাকেনি। ছোটদিদিমণিকে ডেকেছে।

ইন্দুমতীর চোখ নীচু হয়ে যায়। কিছু বলে না।

মধুমতী বলতে বলতে ওঠে,—আমাকে আবার কেন—!

তারপর ড্রইংরুম থেকে ভেসে আসে হাসি আর কথার টুকরো টুকরো আওয়াজ। কোনদিন বা অর্গানে মধুর গানের স্বর, সঙ্গে হয়ত কোন পুরুষের কণ্ঠস্বর।

মধুমতীর বুদ্ধির দীপ্তিতে চরিত্র চাঞ্চল্যে, সাজে পোষাকে, অতি সহজ সাহসিকার মত ভাবভঙ্গীতে কুন্তলবাবু শুধু মুগ্ধই হয় না, গর্ব অনুভব করে। বন্ধুদের কাছে ওকে পরিচয় করিয়ে দিতে ভারী আরাম পায় কুন্তলবাবু।

ইন্দুকে দিয়ে তার মনের যে সাধ মেটেনি। মধুমতী তা মেটাতে

পারছে। মধুমতীকে আজকাল সর্ব্বত্রই প্রায় সঙ্গে নিয়ে যায় কুন্তলবাবু।

বাড়ীতে বন্ধু বান্ধবদের আড্ডাও ক্রমশঃ বেড়েই চলে।

চা, সিঙাড়া, কফি, ফল, কাটলেট, লেমনেড—এসব পরিবেশনের ভার ইন্দুমতীকেই নিতে হয়। ইন্দুমতী বেরোয় না। ভেতর থেকে সব পরিবেশন করায়। বন্ধুরা মধুমতীকে নিয়ে গল্পে আড্ডায় গানে বাজনায় মশগুল হয়ে থাকে রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্তও। প্রথম পরিচয় হলে মধুমতী ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে রঙ মাখা ঠোঁটে একটু হাসি এনে হাত দুটো জুড়ে যেভাবে নমস্কার জানায় সত্যি তাকিয়ে দেখবার মত। ইন্দুর সঙ্গে কেন ; মিস্‌টার বাসুর অতি সজ্জিতা আধুনিকা স্ত্রী মিসের রত্না বসুর সঙ্গে তুলনা করলেও মধুমতীকে বেশী সুন্দর সহজ বলে মনে হয়।

মিস্‌টার বাসুও তাই বলে ফেলেছিল,—ইউ শুড্ বি প্রাউড্ অব্ ইওর সিস্‌টার-ইন্-ল'

কুন্তলবাবু গর্ব্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সিগারেটে ধোঁয়া ছেড়েছিল মিস্‌টার বাসুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে।

মিঃ মেহরা প্রথম পরিচয়ে হাঁ করে রইল কিছুক্ষণ। মধুমতী চোখের ইসারা জানিয়ে বললো,—বসুন।

মেহরার মুখে কথা ফুটল না। বসতে বসতে কুন্তলবাবুকে শুধু বললে,—হাউ প্রেটি !

কুন্তলবাবু হাসলো আবার।

মধুমতী কৃত্রিম লজ্জার ভাব মুখে এনে তাকালো একবার মেহরার দিকে। মেহরা তখন গলে পড়ছে। কোমর কাটা আঁট জামার ওপর পাতলা নীল রঙের সাড়ীখানা উড়ছে ওড়নার মত। মেহরার চোখ আর ফেরে না।

কুন্তলবাবু তখন ভাবে এই ফাঁকে কিকরে মেহরাকে দিয়ে ওদের অফিসের স্যালভেজের পাট সব জলের দরে কেনা যাবে। অফিসের বড় সায়েব ত' মেহরার কথায় ওঠে বসে। এখন মেহরাকে মধুমতীর কথায় ওঠ বোস্ করান যাবে।

সব চেয়ে অবাক করলে জাহাজের কোম্পানীর পার্টনার ছোকরা অজিত সোম। চৌকস ছেলে, পরিষ্কার বলে বসল,—এবার ত' রোজ সন্ধ্যায় চা খেতে আসতেই হবে আপনার বাড়ী।

কুন্তলবাবু বুঝেও শুধোয়,—কেন?

—বারে বা, বাড়ীতে মধু থাকলে মৌমাছি না এসে পারে! ক্ষমা কোরবেন মিস্ রয়।

হেসে ওঠে কুন্তলবাবু। সবাই। মধুও।

মধুমতী বলে,—অনেক মধু কিন্তু ঝাঁজ হয়।

অজিত সোম বলে,—তবু মিস মধুমতী রায়ের গানে যে মধু ঝরে তাতে ঝাঁজ নেই এ আমি হলপ্ করে বলতে পারি। আচ্ছা না হয় পরীক্ষা হয়ে যাক।

কুন্তলবাবুও সমর্থন করে,—একটা গান গাও মধু। মিসটার সোমের কথা যাচাই হয়ে যাক।

অগত্যা মধুমতীকে গাইতে হয়। গলাটা মধুমতীর একটু মোটা কিন্তু তবু মিষ্টি লাগে ওর ছেলেমানুষী ভাবভঙ্গীগুলো!

মধুমতী গান গায়।

যাবার আগে চা আসে।

অজিত সোম বলে, গান শেষ হলে,—মিস্ রয় একদিন গরীবের কুটীরে আসুন। দরজা আপনার জন্যে খোলাই থাকবে।

মধুমতী কুন্তলবাবুর দিকে তাকায়, বলে,—আচ্ছা। দেখি।

—দেখি নয়। আসচে রোববার। আসছেন ত? কুন্তলবাবুও আসুন।

কুন্তলবাবু হেসে বলে,—সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব। না হয়ত' মধুকে পাঠিয়ে দোব।

অজিত সোম বলে,—আপনার সময় না হলে বরং আমি নিয়ে যেতেও পারি।

—বেশত—!—সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে আড় চোখে মধুমতীর দিকে তাকিয়ে বলে। মধুমতীর চোখ দুটো আগের মতই উজ্জ্বল, ভয়ের লেশ মাত্র দেখতে পায় না কুন্তলবাবু।

অজিত সোমের মত একটি পুরুষকে ভয় করবার যে প্রয়োজন আছে, এমন একটা ধারণাও মধুমতীর মনে আসে না। অজিত সোমদের দেখবামাত্র চেনা যায়, বাজাবার কি দরকার? মধুমতীকে স্তুতি করবার জন্যেই ওদের অবির্ভাব—এমনি একটা ধারণা করে নিয়ে আত্মগর্বের আকাশে ভাসে মধুমতী। ফ্রক পরতে যেদিন থেকে ওর লজ্জা হোল সেদিনই ও বুঝল পুরুষের মনের ফাঁকাশে চেহারাটা। কাঙালের মত রক্তহীন, নির্লজ্জ চোখের ভিক্ষে ওর আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতে সুরু কোরল। ও জানল, বাবাই সংসারে একমাত্র পুরুষ নয়। আরও পুরুষ আছে আর তাদের বাবার মত ভয় না করলেও চলে। বড় বড় শক্তিমান পুরুষের চোখে ও সেদিন আবিষ্কার করতে পেরেছিল নির্জীব অসহায় আকুতি, মধুমতীর এককণা কৃপা ভিখারীর দল।

মধুমতী নিজেকে চিনল। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ও সব পুরুষকেই,একরকম দেখছে। সেই এক দৃষ্টি—চোখ ছোট বড় মাঝারি মাত্র।

কুন্তলবাবুও খুসী।

—তবে ওই কথাই রইল।—বলে অজিত সোম মধুমতীর দিকে তেমনি চোখে তাকিয়ে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় মধুমতী। কৃপাবর্ষণ করে তার ওপর।

অজিত সোম কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ। কৃতবিদ্য বলেও মনে হয় মিঃ মেহরা বা মিঃ বাসুর।

মধুকে বলে কুন্তলবাবু একটু যেন হঠাৎ,—দেখোত' আর এক কাপ করে কফি হবে কিনা!

বাইরে ঝিরঝিরে বর্ষণ সুরু হয়েছে। ঘোলাটে আকাশে সন্ধ্যার তারাকুঁচি একটিও দেখতে পাওয়া যায় না। পশ্চিম আকাশের দিকে শুধু একটু আলোরেখা। শীতল মৃদু বাতাসে শিরশির করে ওঠে ভেতরটা। কুঁকড়ে যেতে ইচ্ছে হয়। জানালার কাঁচগুলো বন্ধ করে দিতে বলে কুন্তলবাবু। জানালার দিকে তাকালে দেখা যাবে চোখের সামনে নীচু নীচু একসারি টালির ঘরে কিছু নেপালীর বাস, কিছু বা দেহাতী, ওদের জেনানাদের কিচির-মিচির শোনা যায়। লণ্ঠনের মিটমিটে আলোর দীপ্তি গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পরদার আড়ালে ভারী পাণ্ডুর মনে হয় আকাশেরই মত।

কুন্তলবাবু চোখ ফেরায়। এমন সন্ধ্যায় আরও এক কাপ কফি না হলে কি করে জমে!

মধুমতী ভেতরে যায়।

—ওদিদি। দিদিগো!

ছুটতে ছুটতে এসে মধুমতী দিদির কাঁধদুটো ধরে। আগে থেকে দিদিকে একটু তোয়াজ করে রাখা ভাল। নইলে রেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

তবু রেগে উঠল ইন্দুমতী,—অমন লাফাচ্ছিস কেন?

—আনন্দে। নেমন্তন্ন হোল যে।

—কোথায় আবার। আমি বাপু যেতে পারব না।

ইন্দুমতী ভেবেছে তাকেও বুঝি নিমন্ত্রণ করেছে কেউ। ঠাণ্ডা এক একটা দমকা বাতাস আসে ঘরে। ইন্দুমতী গায়ে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে ভাল করে বসে বলে,—বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ নেমন্তন্ন। বলগে'যা আমি পারব না যেতে। তোর সায়েব বাবু যাকগে।

ইন্দুমতীর দুর্বল স্থানটা আরও নগ্ন করে দেখবার লোভ সামলাতে পারে না মধুমতী, বলে বাঁকা হেসে,—তোমাকে নেমন্তন্ন করতে দায় পড়েছে অজিত বাবুর। নেমন্তন্ন আমার আর সাহেব বাবুর।

নিমেষে ইন্দুমতীর মুখখানা পাণ্ডুর হয়ে ওঠে। কে যেন গায়ে পড়ে অপমান করে গেল ওকে আর সেটা যেন মধু জেনে ফেলেছে। ওর জ্বালাময় বেদনার স্থানটা মধু যেন আরও বেশী করে মুচড়ে দিয়েছে, ইন্দুমতী সহসা কথা বলতে পারে না। মধুমতী খিলখিল করে হেসে ওঠে,—কফি দেবে নাকি বলো?

মধুমতীর দিকে বেদনাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীরে বলে ইন্দুমতী,

—দিচ্ছি।

পাঠিয়ে দিও চাকর দিয়ে। আমি চললুম। একটু পরে আবার সিনেমায় যেতে হবে সায়েব বাবুর সঙ্গে।

তেমনি চঞ্চল-পদক্ষেপে চলে যায় মধুমতী।

ইন্দুমতী কফি তৈরী করতে ওঠে।

কফির কাপগুলো সাজিয়ে দিয়ে চাকরকে বলে,—বাবুকে একবার ডাকবি।

চাকর চলে যায়।

ইন্দুমতী স্থানুর মত বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পর চাকরটা আসে। ইন্দু শুধোয়। বাবু এলো না।

—না। বললে, এখন সময় হবে না।

ইন্দুমতী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে চাকরকে,—বল এখুনি ডাকছে। আবার যা।

চাকর আবার যায়।

এবার কুন্তলবাবু আসে, ভ্রূদুটো কুঁচকে সামনে আসতেই ইন্দুমতী হেসে বলে,—বোস না।

কুন্তলবাবু বলে,—বসবার সময় নেই। কি বলবে বলো।

—বলছিলাম কি শরীরটে ভাল নেই।

—কি হয়েছে ?

ইন্দুমতী কুন্তলবাবুর কাছে আসে, বলে,—মাথাটা ধরেচে। চলো না আজ কোন সিনেমায় বরং যাই।

কুন্তলবাবু গম্ভীরস্বরে বলে,—সিনেমায় গেলে আরও মাথা ধরবে। বরং চুপ করে শুয়ে থাকো।

ইন্দুমতী আর কথা বলতে পারে না। কেমন লজ্জা হয় যেন।

কুন্তলবাবু চলে যায়।

ঠিক সময়ে মধুমতীকে নিয়ে সিনেমা থেকে ঘুরে আসে কুন্তলবাবু। মধুমতী ঘরে ঢুকেই কথা বলতে সুরু করে। স্রোতস্বিনী নদীর মত কল্‌কল্ করে কইতে না পারলে ওর যেন স্বস্তি নেই।

হাঁপাতে হাঁপাতে ও বলে,—উঃ কি ভীষণ ভাল বই দিদি। তুই ত' গেলিনে!

—তাই নাকি ? ইন্দুমতী হাসতে চেষ্টা করে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মধুমতী,—কি ফাইন! বউটার কি মুখ দিদি আর স্বামীটা একেবারে গোবর-গণেশ। সায়েব বাবু ত' হেসে খুন। বলে

আমার ভারী ভাল লাগে এমনি বড় বউ।

বললুম,—আমার দিদিকে খুব ঠাণ্ডা মানুষ পেয়েছো কিনা! আবার গাড়ীতে আসতে আসতে বলে চলো কোন হোটেলে খেয়ে নিই। বললুম, —বাব্বা! দিদি তা হলে আর আস্ত রাখবে না!

ইন্দুমতী হাসে,—খেয়ে এলেই ত' পারতিস!

—তুমি কিছু বলতে না। সায়েব বাবু তোমার হাতের রান্না একদিন না খেলে তোমার রাগে মুখ ফুলে যায়।

—তোকে কানে কানে বলতে গেছি!

—বলতে গেছোই ত'! সেদিন এঁচোড়ের চপ করে রাখলে সয়েব বাবু খেলো না। তুমিও ত' খেলে না সমস্ত দিন। সন্ধ্যেবেলা আবার সেই চপ রেঁধে তাকে দাও, তবে খাও। কি স্বামীভক্তিরে বাবা। আমরা হলে বয়ে যেতো না খেয়ে থাকতে। খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগাতুম, বিকেলে রাগ করে বসে থাকতুম। সাধাতুম। তুমি একেবারে ভালোমানুষ দিদি। সবেতেই বাড়াবাড়ি।

—নে চুপ কর্। খেতে ডাক তোর সায়েব বাবুকে।

মধুমতী বলে ,—বলো আগে খেয়ে এলে বকতে?

—না, না বকতাম না। ডেকে নিয়ে আয় ওঁকে। আজ সরষেবাঁটা দিয়ে বেলেমাছ করেছি। উনি খুব ভাল বাসেন।

—ওবে বাস্‌রে আর উপায় নেই। আমরা পেটপুরে খেয়ে এসেছি হোটেলে।

ইন্দুমতী অবাক,—এই যে বললি খায়নি।

মধুমতী হেসে ওঠে খিলখিল করে, কাঁচ ভাঙা আওয়াজ যেন,— দেখছিলাম তুমি কি বলো। বকতে পাবে না কিন্তু। বলেছ বকবে না।

ইন্দুমতী আর একটাও কথা বলতে পারে না।

মধুমতী গানের একটা কলি ভাঙতে ভাঙতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে।

ইন্দুমতী অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

নির্মেঘ আকাশে দখিন পূবে চাঁদ দেখা যায়। তারাগুলো চিকচিক করে জ্বলে নেভে জোনাকীর মত। ইন্দুমতী শুধু তাকিয়ে থাকতেই পারে।

একখণ্ড মেঘ এসে ঢাকে চাঁদকে। মেঘ সরতে থাকে। এ মেঘ কি সরবে?

ইন্দুমতী আঁচলে গালের ওপরটা মুছে নেয়—মুছে নেয় চোখের কোনদুটো অন্ধকারে সকলের আড়ালে। আবার মোছে।

উদয়ের ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

ইন্দু উদয়ের ঘরের দিকে এগোয়।

দরজা ভেজানো ছিল। জানালা দিয়ে তাকায় ইন্দুমতী। উদয় কাগজে কি লিখছে ঘাড় নীচু করে—এক মনে। সামনে মোমবাতি। বিদ্যুৎবাতি থাকা সত্ত্বেও মোমবাতি কেন বোঝে না ইন্দুমতী।

ডাকে,—উদয়।

উদয় চমকে তাকায়,—দিদি! এত রাতে?

উদয় দরজাটা খোলে,—কি ব্যাপার দিদি?

—কিছু নয় ভাই। তোমার খাওয়া হয়নি?

—না দিদি।

—তোমার মায়ের?

—মা ত' একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে শুয়ে পড়েছে। বোধহয় ঘুমিয়েও পড়েছে।

ইন্দুমতী শুধোয়,—তুমি কি খাবে ভাই?

উদয় সলজ্জ হাসে,—ওই দেখো আপনার অত খোঁজে কি দরকার ?

—বলো না ভাই।

—মিথ্যে আপনার কাছে বলতে পারবো না। চিড়ে আর দই আছে। ওইতেই চলে যাবে। রাত্রিরে আমার খুব খিদেও পায় না।

ইন্দুমতী হাসে এবার প্রাণভরে,—কি আক্কেল তোমার! বাড়ীতে দিদি থাকতে ভাই না খেয়ে থাকবে। মিথ্যেই তুমি আমাকে দিদি বলে ডাকো ভাই। কাল থেকে আর ডেকো না। এর পর থেকে কোন দিন যদি শুনি ভাত না খেয়ে আছো, অথচ আমায় কিছু বলোনি। কথা বলব না তোমার সঙ্গে।

উঁদয় হাসতে থাকে,—বেশ তাই হবে।

ইন্দুমতী হুকুম করে যায়,—বসে পড়াশুনো করো। আমি আসচি।

উদয় আবার লিখতে বসে।

ইন্দুমতী বেলেমাছ চচ্চড়ি থেকে শুরু করে ঝোল ঝাল সব বাটি সাজিয়ে নিজে হাতে করে আনে উদয়ের ঘরে।

মাটিতে রেখে বলে,—নাও বোস। খেয়ে নাও।

উদয় তখুনি ওঠে,—খাবারের পরিমাণ দেখে বলে,—এ-যে অনেক দিদি।

—অনেক না হাতী! নাও হাত ধুয়ে বোস। কিছু ফেলতে পাবে না। বসে রইলুম আমি।

উদয় খুব খানিকটা হাসে,—মরে যাব কিন্তু।

—মরলে আমি আছি;—এতক্ষণে হালকা হয়ে হাসতে পারে ইন্দু।

কিছুই ফেলতে দেয় না ইন্দুমতী।

উদয়কে পেট ভরে খাইয়ে ইন্দুমতী এঁটোটা নিয়ে ওঠে।

উদয় বারণ করতে যায়,—ওটা না হয় আমিই ফেলতুম।

—কেন বলো ত' ?—ইন্দুমতী সস্নেহ রাগে তাকায় ওর দিকে।

—আপনার ত' অভ্যেস নেই।

ইন্দুমতী বলে,—কি করে জানলে ভাই। এখানে এসেই না হয় ঠাকুর চাকর রাখল। আমার বাবাত' গরীব ছিলেন। গরীবের মেয়ের সবই করতে হয়েছে। শৈশবের অভ্যেস ত' আজও যায়নি—তাইত' এত জ্বালা।

শেষের দিকটা বলতে বলতে ইন্দুমতীর গলাটা ধরে আসে।

উদয় সেটা লক্ষ্য করে তবু কিছু বলেনা।

ইন্দুমতী আপন মনেই বলতে থাকে,—আমরা খুব গরীব ছিলাম, তুমি বুঝি জানতে না ?

উদয় বলে,না ত'।

—বাবা মাস্টারী করতেন। সামান্য মাইনে। তাতে চলত না সংসার। লোকে বলত' ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নিতে। তবু টিউশ্যানী করে টাকা নিতে পারতেন না। ছাত্ররা যদি বলত, টাকা দেবার মত ক্ষমতা নেই মাস্টার মশায়। বাবা টাকা নিতে পারতেন না। বলতেন, আহা গরীব না দিতে পারলে কি করবে!

—বড় ভাল মানুষ ছিলেন ত'বে ?—উদয় বলে।

ইন্দুমতীর চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে,—দেবতার মত ছিলেন। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না ভাই। আজ অবধি অমন মানুষ আমি দেখিনি।

উদয় চুপ করে থাকে।

ইন্দুমতী বলে,—শোও এখন। আমি চললুম।

ইন্দুমতী বেরিয়ে যায়।

এঁটো বাসন রেখে হাত পা ধুয়ে শোবার ঘরের দিকে যায়।

রাত্রে আর কিছুই খেতে ইচ্ছে হয় না। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। তাকায় আবার আকাশের দিকে। মেঘের পর মেঘ ঢেকে ফেলেছে চাঁদকে। ইন্দুমতী অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

মধুমতীর ওপর কেমন যেন মায়া হয়। একটু আমোদ করছে বইত' নয়!

তা হোক! মধুত' ছেলেমানুষ। ওকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করছে করুক ভাবে ইন্দুমতী। আহা, মা নেই বাবা মারা গেল! দিদির কাছে থেকে একটু আনন্দ করলে ক্ষতি কি? তাছাড়া ওঁরও ত' সখ মিটছে গান বাজনার। ইন্দুমতী কিছুই বলেনা তাই। বলবার মত কিছু খুঁজেও পায় না। সাংসারিক দরকারী কথা ছাড়া কুন্তলবাবুর সঙ্গে আর কোন কথাও হয় না আজকাল। শুধু চা, কফি বা সরবতটুকু দেয় তাকে ইন্দুমতী, আর খাবার সময় বসে থাকে সামনে। কম খেলে অনুযোগ করে। বেশী খেলে বলে, লেবুর জল খেয়ো আজ। কুন্তলবাবুও, যা বলে তাই শোনে। কিন্তু কথা বেশী বলে না।

সকালে অফিস বেরোবার সময় মধুও যায় কুন্তলবাবুর সঙ্গে। ওকে বেথুনে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে কাজে যায় কুন্তলবাবুর। ফেরে একটা অথবা দেড়টায়। বাড়ীতে আহারাদির পর আবার বেরোয় কুন্তলবাবু। আসবার সময় আবার কলেজ থেকে মধুকে নিয়ে আসে। আসতে আসতে ক্লান্ত শরীর গাড়ীর ভেতর এলিয়ে দেয় কুন্তলবাবু। অনেকদিন লক্ষ্য করেছে মধু—কুন্তলবাবু হয়ত একখানা হাত তার পিঠের ওপর আনে। মধু কিছু বলে না। ওর এক বিচিত্র স্বভাব, যৌবনের তীব্রতার জ্বালায় ছট্‌ফটিয়ে বেড়ায় ও, সে জ্বালা যেন কিছুটা উপশম হয়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন শিরশির

করে ওঠে মাঝে মাঝে। পিঠের ওপর থেকে ও কুন্তলবাবুর হাতখানা আরও একটু টেনে আনে। এটা কিছু খারাপ, মনে হয় না একেবারেই। ওর কাছে। এটা অত্যন্ত হাল্‌কা ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। এক অদ্ভুত আরামের অনুভূতি আসে ওর, কুন্তলবাবু হয়ত অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। মধু কিন্তু বাড়ী এসেই আবার এসব কথা ভুলে যায়। কোন এক দানবীয় ক্ষুধা চাপে ওর ওপর মাঝে মাঝে। সে ক্ষুধার উপশম হলেই, মধুমতী একেবারে ভাল মেয়ে।

ওর কাছে যেটা ক্ষুধা অন্যের কাছে সেটা খাদ্য আর অন্যের ক্ষুধা ওর খাদ্য। সংসারের এ-বিচিত্র নিয়মের খবর খুব ভাল করেই রাখে মধুমতী।

তাই হয়ত বা অন্য কোন কারণেও মধুমতী অকস্মাৎ একদিন অজিতকে বলে, একটু দয়াপরবশ হয়ে,—আসুন না কাল আমার কলেজে ঠিক চারটের। যাব সিনেমায়। বলছেন ত' ছবিটা খুব ভাল হয়েছে।

অজিত হাতের কাছে চাঁদ পেয়ে নেচে ওঠে—সত্যিই সিনেমায় যাবেন?

লোকটি নিতান্তই কৃপার পাত্র। একটু তাচ্ছিল্যের হাসি ঠোঁটে এনে বলে মধুমতী,—আপনাকে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

—না বলছিলুম কি—যদি আবার কোন কাজে আটকে পড়েন?

—আমার আবার কাজ কি!—খিলখিল করে হাসে মধুমতী।

বন্ধুর করুণ অবস্থা দেখে কুন্তলবাবু একটু যেন করুণা করে বলে,—না, ওর আর কি কাজ। তাছাড়া আপনাকে যখন কথা দিয়েছে তখন ওর না যাওয়াটাই অন্যায় হবে।

অজিতবাবু সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে পা নাচাতে নাচাতে বলে,—তাছাড়া ওঁর লাভটাও ত' কম হবে না, ছবিখানা সত্যিই দেখবার মত।

কথা ঠিক হয়ে যায়।

পরদিন পৌনে চারটে থেকেই হাজিরা দিতে থাকে অজিতবাবু। ঠিক চারটেয় বেরোয় মধুমতী। অজিতবাবু এগিয়ে এসে গাড়ীর দরজা খুলে দেয়,—বসুন।

—না বসব না।

—কেন ?—মুখ শুকিয়ে যায় লোকটার।

মধুমতী মুখ ভার করে বলে,—না, ভেতরে বসব না।

—তবে কোথায় ?

—সামনে আপনার পাশে।

অজিত বাবুর মুখে মেঘের ফাঁকে এক ঝলক রোদ এসে লাগে যেন,—এই কথা ! বসুন।

পাশাপাশি বসে অজিত বাবু গাড়ী চালাতে সুরু করে।

মধুমতী সরে আসে কাছে।

অজিতবাবুর হাতের ষ্টিয়ারিং কাঁপে।

মধুমতী বলে,—ছটার ত' অনেক দেরী। চলুন না অন্য কোথাও।

—বলুন। কোথায় যাব ?

—আপনার যেখানে খুসী,—মধুমতী অজিতবাবুর ওপর যেন পূরো নির্ভর করে এগিয়ে বসে। অজিতবাবুর কাঁধে একটা ঠেলা দেয়।

—আরও জোরে চালান না।

ভদ্রলোকের কপাল ঘামে, নাকের ডগা ঘামে। মধুমতীর স্পর্শেই যেন ওর স্নায়ুগুলো থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে কি স্বপ্ন দেখছে ! এত ভাগ্য তার !

মধুমতী একেবারে ছেলেমানুষের মত ছটফট করে। ওর কাঁধে হাত রেখে বলে,—কই কথা বলুন।

অজিতবাবুর' গলাটা শুকিয়ে গেছে। বলে কোনমতে,—চলুন কোন

চায়ের দোকানে।

—তাই চলুন।

এক চায়ের দোকানের সামনে গাড়ী থামে। ওরা নামে।

দোকানে ঢুকে কিছু মাংস রুটি খেয়ে বেরিয়ে আসে।

অজিতবাবু এতক্ষণে কথা বলতে পারে,—এবার কোথা যাবেন।

—বাঃ! সিনেমায় চলুন।

—মোটেত' সওয়া পাঁচটা, আরও কিছুক্ষণ বেড়ান যাক।

—যা খুসী।—বলে ঠোঁটটা উলটে মধুমতী গাড়ীতে চেপে বসে।

মধুমতী আলগোছে কথা সুরু করে,—আচ্ছা অজিতবাবু আপনি কি ভালবাসেন?

—কেন বলুন ত'?

মধুমতী যেন বিরক্ত হয়,—সব কথার কি কেন আছে?

অজিতবাবু বলে,—সবই ভালবাসি।

—তবু কি কি বেশী ভালবাসেন।

—প্রশ্নটা আপনাকে করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।—বলে অজিতবাবু।

মধুমতী খিলখিল করে হাসে,—আমি?

—হুঁ।

—একএকসময় একএকটি জিনিষ ভালবাসি।

—এখন কি ভালবাসেন।

—এই মুহূর্তে আপনাকে ভাল লাগছে।

অজিত বাবুর বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে।

মধুমতী যেন ওর বুকের শব্দ শুনতে পেয়েছে। কি বোকা! আর কত সহজে নাচে। খুব হাসতে থাকে মধুমতী।

অজিতবাবু গম্ভীর স্বরে বলতে চেষ্টা করে,—এ মুহূর্তটা কি চির

কালের হতে পারে না ?

—এই সেরেছে ! আপনি সিরিয়াস হয়ে পড়ছেন ;—মধুমতী অজস্র হাসে।

অজিতবাবু তবু গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।

—কই জবাব দিলেন নাত' ?

—কি জবাব দোব।

—চিরকালের মত মুহূর্তটিকে কি দিয়ে বাঁধা যায় ?

—কচু দিয়ে। আপনার ওসব কাব্য বুঝিনে। একটা কথা বললাম সরলভাবে আর অমনি আপনার সুরু হোল কাব্যি। আপনারা সবাই সমান।

অজিতবাবু একটা ধাক্কা খায়।

তবু সে এ সুযোগটুকু হারাতে রাজী নয়।

বলে,—একটা জবাব ত দেবেন ?

—জবাব নেই।

—তবে কি আছে ?

—কিছুই নয়। চলুন আমায় বাসায় পৌঁছে দেবেন। সিনেমা দেখা থাক আজ।

—কেন কি হোল ?

—না। আপনার এত লম্বা লম্বা কথার জবাব দেবার সময় নেই আমার।

—কিন্তু আমার কথা ত্' ভেবেছেন, নিশ্চয়ই।

—না।

—একেবারেই নয় ?

—না।

অজিতবাবু আর কথা বলে না। গলাটা ওর বন্ধ হয়ে আসে, গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে মধুকে কুন্তলবাবুর বাড়ী।

ঢুকেই দেখে বাইরের ঘরে কুন্তলবাবু চুরুট ধরিয়ে বসে আছে।

মধুমতী বেলুনের মত ফেটে পড়ে,---আপনার বন্ধুগুলো কি হ্যাংলা সায়েববাবু।

কুন্তলবাবু চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে তাকায় জিজ্ঞাসু চোখে।

—কি হোল ?

—আপনার মাথা। আপনার বন্ধুরা কি কখনও মেয়ে দেখেনি ?

—তোমার মত মেয়ে দেখা খুবই দুষ্কর, সংসারে আদৌ আছে কিনা সন্দেহ।

—মানে ?

—মানে ত' তোমার বোঝবার কথা নয়,—হাসতে হাসতে চুরুট ঠোঁটে লাগায় কুন্তলবাবু।

- খুব বুঝি। আপনাকেও কম বুঝি না।

—তাই নাকি। বলোত' কি বুঝেছ আমার কথা ?

—আপনারও কথা আপনার বন্ধুদেরই মত।

কুন্তলবাবু হাসতে থাকে।

ইন্দুমতী ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

কুন্তলবাবু বলে,---শ্যালিকাটি আমার খুব বেশী মিষ্টি লাগে।

মধুমতী খিলখিল করে হাসে,—দিদির চেয়েও ?

কুন্তলবাবু চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ে---তোমার দিদিকে অনেক সময় মেয়ে বলেই মনে হয় না।

—কি মনে হয় ?

—মানে কি জানো—ঠিক রক্ত-মাংসের মানুষ বলে ভাবা শক্ত।

—তবে কি ভাবা যায় ?

—পুতুলের মত। মাটীর পুতুল। দেখতে সুন্দর। প্রতিমার মত। বাইরে শোভা।

—ভেতরে ?

—খড় কুটো আর মাটি।

ইন্দুমতী ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শোনে।

মধুর গলা শোনে, কাঁচভাঙা আওয়াজের হাসির ঢেউ তুলে বলে মধু,—এ কিন্তু আপনার ভারী অন্যায়, শ্যালিকার ওপর এত টান !

—সম্পর্কটা কি টানের নয় !

—তা বটে, কিন্তু দিদির কি কষ্ট হবে শুনলে !

—কিছুই কষ্ট নেই। স্ত্রীর অপারগা অবস্থায় শ্যালিকাই ত' অবলম্বন।

মধুমতীর কর্ণমূল রাঙা হয়ে ওঠে,—অসভ্য ! কি যে যা তা' বলেন !

কুন্তলবাবু খুব খানিকটা হাসতে থাকে।

ইন্দুমতী ঘরে ঢুকতে পারে না !

ফিরে যায় ওখান থেকে।

কুন্তলবাবু বন্ধুদের সঙ্গে মধুমতীর সাম্প্রতিক ব্যবহার জানত ইন্দুমতী। বয়েসের মেয়ে অমন একটু চঞ্চল হয়েই থাকে। তবু ভাল লাগত না অনেক সময় তার আদিখ্যেতা, তার অভদ্রতা। আরও একটু সংযত হওয়া মানুষের ধর্ম। বিশেষ করে মেয়েমানুষের। দু'একদিন বাধা দেবার চেষ্টা যে ইন্দুমতী করেনি তা নয়। হয়ত দেখছে মধু বেরোচ্ছে। শুধিয়েছে, কোথা যাচ্ছিস ?

—মিঃ মেহরার ড্রাইভার এসেছে নিয়ে যেতে।

ইন্দুমতী দৃঢ় কণ্ঠে বলেছে,—আজ তোমার যাওয়া হবে না।

—কেন?

—আজ লক্ষ্মীপূজো। জুতো ব্যাগ রেখে পূজোর কাছে বসবে এসো।

মধুমতী এসে ইন্দুর গলা জড়িয়ে ধরেছে,—লক্ষ্মীটি দিদি। আজকে ছেড়ে দাও। কথা দিয়েছি যাব। কথার খেলাপ হবে। ভদ্রলোক এত আশা করে গাড়ী পাঠিয়েছে। আজকে ছেড়ে দাও দিদি।

ইন্দুর মনটা গলে যায়। আহা ছেলেমানুষ! একটু আমোদ চায় বইত' নয়। কিছুই বলেনি আর। এমন ত' কতদিনই হয়েছে।

কিন্তু আজ কুন্তলবাবুর সঙ্গে তার কথাগুলো যেন কেমন বেমানান শোনাল। ঠিক যেন আমোদ আহ্লাদের সহজভাব নয়। ভেতরে যেন এক গভীর কোন সুরের সন্ধান মেলে। ইন্দুমতীর সরল মনের কোনায় যেন একটু বাঁক দেয়। কেন যেন মনে আসে অনেক অসংলগ্ন অবাস্তব চিন্তা। খুবই অসম্ভব কতকগুলো ভবিষ্যত ঘটনার কল্পনা এসে জুড়ে বসে মনে। ইন্দুমতী নিজেকে স্থির করতে চেয়েও পারে না।

আবার বাইরের ঘরের দিকেই যায়, গিয়ে দেখে মধুমতী তার নিজের ঘরে চলে গেছে। ইন্দুমতী ঘরে ঢোকে। কুন্তলবাবু চুরুটটা ধরিয়ে বসেছিলো। কপালে চিন্তার কুঞ্চন।

ইন্দুমতীকে দেখে যেন থমকে যায় কুন্তলবাবু।

—কে?

—আমি।—ম্লান মুখেও হাসি আনবার চেষ্টা করে ইন্দু খুব সহজ হবার জন্যে।

কুন্তলবাবু একবার তাকিয়ে আবার চুরুট টানতে থাকে। কথা বলে না।

ইন্দুমতী বলে,—কেন, ভয় পেলে নাকি আমায় দেখে!

কুন্তলবাবু বাঁকা হাসে,—আমাকে এতই ভীতু বলে মনে হয়!

—না তা' হয় না। তবুও বলা ত' যায় না। মনে গোপন কিছু থাকলেই সেটা ভয়ের রূপ নেয় কিনা।

কুন্তলবাবু চুরুট টানে।

ইন্দুমতী জানালার পাশে আসে। বাইরের দিকে তাকায়। আকাশটা কি গাঢ় নীল—সমুদ্রের মত। শুধু ঢেউ নেই—থমথমে নিস্তরংগ।

ইন্দুমতী পর্দাটা টেনে দেয় জানালার।

—একটা কথা ছিল।

কুন্তলবাবু মুখতোলে,—কি ?

—ভাবছিলাম মধুকে কোন বোর্ডিংয়ে রেখে পড়ালে কেমন হয়।

কুন্তলবাবু চোখ ফেরায়,—ওকে শুধোও।

—না, মানে বড় চঞ্চল কিনা। এই বয়সে একটু কড়াকড়ির ভেতর রাখাটাই ভাল নয় কি ?

—বোধহয় ভাল।

—বোধহয় কেন ?

—তবে বোধহয় খারাপ।

—না, বলছিলাম, তোমার কি মত!—বলে ইন্দুমতী।

চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কুন্তলবাবু বলে,—আমার কোন মতামত নেই। মধুর যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তার নিজের কথা ভাববার।

ইন্দু হাসে,—যথেষ্ট বয়েস কিছু হয়নি। তবু ওর একবার মত নেয়াটা দরকার বটে।

—তবে, তাই করো।

—হু। তোমার ত' অমত নেই।

কুন্তলবাবু আর একটা চুরুট ধরায়। কথা বলে না।

—বলো ?

—আমার বলবার কিছু নেই।

ইন্দুমতীর শরীরটা হঠাৎ যেন রাগে জ্বলে ওঠে। ডাকে,—মধু ! মধু !

—যাই দিদি !—সাড়া পাওয়া যায়। সাড়ী বদলে মধু এসে হাজির, প্রায় লাফাতে লাফাতে।

ইন্দুমতীর মাথার তালুটা জ্বলে যায়,—লাফাচ্ছিস কেন, হাঁটতে পারিস না ?

—না দিদি।—মধু হাসে, হাঁটতে গেলেই কেন-যে লাফাতে ইচ্ছে হয়।

—শোন, তোমায় বোর্ডিংয়ে যেতে হবে,—ইন্দুমতীর কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক দৃঢ়তা দেখে কুন্তলবাবু অবাক হয়ে তাকায়।

মধু প্রশ্নটা বুঝতে পারে না। পরে কথাটা বুঝে চোখ বড় বড় করে বলে ওঠে,—ওরে বাপরে ! বোর্ডিং নয়ত' বনবাস ! ও আমি পারব না।

পারতে হবে। কালই যেতে হবে, আমি কাল সকালেই সব ব্যবস্থা কোরব।

মধু বলে,—আমি যেতে পারব না। লক্ষ্মী দিদি।

ইন্দুমতী সমস্ত স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে,—বড় অবাধ্য হয়েছো মধু ! মুখের ওপর কথা বোলছ। লজ্জাও নেই।

মধুমতী অকস্মাৎ দিদির এই অস্বাভাবিক ধমকে চুপ হয়ে যায়।

একটু পরেই ওর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে থাকে।

ও বার বার বলে,—আমি যাব না। কিছুতেই যাব না। তাড়িয়ে দিলেও যাব না।

বলতে বলতে ঘর থেকে চলে যায়।

ইন্দুমতী নিজের অজ্ঞাতে নিজের ব্যবহারে যেন মাটীতে মিশে যেতে চায়।

কুন্তলবাবুর দিকে তাকায়।

কুন্তলবাবুর মুখখানা টকটকে লাল, একবার শুধু বলে,—ইন্দু ও এত উত্তেজিত হলে!

ইন্দুমতী মুখ নীচু করে শুধু বলতে পারে,—আমায় ক্ষমা কোর। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নিজের ঘরে গিয়ে ইন্দুমতী খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। পিঠটা ওর ফুলে ফুলে ওঠে হয়ত বা অশ্রুর আবেগে। কতক্ষণ পড়ে থাকে এই ভাবে।

সন্ধ্যা কখন উতরে গেছে।

ধীরে ধীরে ওঠে ইন্দুমতী, বাইরে বারান্দায় এসে সাড়াশব্দ পায় না কোথাও। অন্যদিন হলে মধুর হাসি অথবা গানে বাড়ীর বাইরের দিকটা মুখর হয়ে থাকে।

ইন্দুমতী এগিয়ে যায় মধুমতীর ঘরের কাছে। দেখে আলোটা নেভা। ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালে। দেখে মধুমতী শুয়ে আছে বিছানায়।

আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়ে ডাকে,—মধু!

মধুমতী ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু পরিষ্কার চোখে পড়ে ওর চোখের কোণে জলের দাগ।

ইন্দুমতীর বুকের ভেতরটা মোচড় দেয়। বাপ মা নেই। দিদি ছাড়া আর ওর কেই বা আছে। হাজার হোক ছেলেমানুষ ত' !

—মধু! অ মধু!

মধুমতী নড়ে ওঠে।

—চল খেতে চল।

মধুমতী ও-পাশ ফিরে শোয়।

ইন্দু ওর পিঠে সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে বলে,—ও' লক্ষ্মী বোনটি, চল খাবিনে ?

দিদির সস্নেহ স্পর্শে মধুমতীর চোখে জল আসে আবার।

মুখ গুঁজে পড়ে থাকে।

ইন্দুমতী জোর করে ওকে এপাশ ফিরিয়ে নিজের আঁচল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

—আর কখনো বকব না।

—দিব্যি করে বলছি খাবি আর।

অনেক সাধ্য সাধনার পর মধুমতী ওঠে। ইন্দুমতী মনে মনে অনেকবার প্রতিজ্ঞা করে মধুমতীকে আর কখনও কোন কঠিন কথা বলবে না। যত অন্যায়ই করুক না কেন, দিদি হয়ে তাকে ক্ষমা করতে না পারলে কে আর ক্ষমা করবে ওকে।

খেতে বসে কুন্তলবাবু বলে,—মধু তাহলে কালই যাচ্ছে বোর্ডিংয়ে।

জবাব দেয় ইন্দুমতী,—না, মধু যাবে কেন শুনি ? তুমি কি ওকে তাড়াতে পারলে বাঁচ ?

—আমি !—অবাক হয়ে কুন্তলবাবু তাকায়।

—তাছাড়া আবার কি ! ওর দিদি খারাপ, ও খারাপ। যত ভাল তুমি। তাড়াতে হয় আমাদের দুজনকেই তাড়িয়ে দাও।

কুন্তলবাবু হাসে,—মধুও কি দিদির মতই স্বীকার কোরছ।

মধুমতী দিদির পাশে বসে খেতে খেতে মাছের কাঁটা বাছে নিতান্ত শান্তশিষ্ট মেয়ের মত।

ইন্দুমতী হাসতে হাসতে বলে,—নিশ্চয়ই। ওর দিদির মত আর ওর মত আলাদা কখনও হতে পারে!

—তা বটে, দেখা যাবে।—বলে চুপ করে খেতে থাকে কুন্তলবাবু।

এরপর কিছুদিন কেটে যায়। কুন্তলবাবু মধুমতীর সংগে একটু যেন এড়িয়ে চলে।

এমন কি পরদিন মধুমতীকে ইস্কুল থেকে আনতেও নিজে যায় না।

উদয়কে বলে,—তুমি একবার যেও। মধুকে নিয়ে এসো।

উদয় রাজী হয়।

সাড়ে চারটায় গিয়ে পৌঁছয়, দেখে মধুমতী অপেক্ষা করছিলো গেটের কাছে। উদয় যেতেই বলে,—রাত্তির নটায় এলেই হোত! সায়েববাবু কই?

উদয় চটে না। মেয়েটার বাইরের রূপ ও ধরে ফেলেছে, আসলে ভেতরে মেয়েটা অমন নয়। ও একটু হেসে বলে,—তিনি আসতে পারবেন না।

—তাই বুঝি আপনি আধঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলেন আমাকে।

উদয় বলে,—একা একা যাবার সাহস না থাকলে দাঁড়িয়ে থাকতেই হয়। চলুন।

মধুমতী চটে যায়,—যাব না। আপনি চোখের সামনে থেকে চলে যান। আমি একা যাব।

—তবে ত' ভালই।—উদয় চলে যেতে চায়।

মধুমতী ডাকে,—শুনুন!

—আবার কি?—উদয় ফেরে।

মধু নিদারুণ চটেছে, বলে,—বোকার মত বকবক না করে একটা ট্যাক্সি ডাকুন।

উদয় বলে,—আমিও ত' তাই বলছি বোকার মত বক্‌বক্ করে শুধু কি লাভ।

বলে ট্যাক্সির খোঁজে একটু এগিয়ে যায়।

ট্যাক্সি একটা নিয়ে আসে। মধুমতী উঁচু হীল জুতো খট্‌খট্ শব্দ করে রাগের লক্ষণ প্রকাশ করে গিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠে।

মধু উদয়ের দিকে বারে বারে তাকায়, ট্যাক্সি তখন চলছে। উদয়ের প্রশস্ত কপালে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল আর বড় বড় চোখের দিকে তাকাতে মধুর চোখ নরম হয়ে আসে।

মধু হঠাৎ যেন খুব মিষ্টি করে বলে,—চলুন না অন্য কোথাও একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

উদয় তাকায় মধুমতীর দিকে, স্পষ্ট দেখতে পায় ওর চোখে কল্পনার আলতো রঙের আভাস। একটু কঠিন কণ্ঠে বলে,—না।

—কেন আপনার কাজ আছে কিছু?

—না।

—তবে দিদি কিছু বলে দিয়েছে?

—না।

চটে যায় মধু,—না—না—না! ব্যস্ জবাব হয়ে গেল। তারপর রেগে বলে,—আমি বলছি বেড়াতে যেতে হবে। আমার হুকুম।

—অর্থাৎ আমি চাকর। চাকরী করি,—এইত'!—হাসে উদয়।

মধু বলে,—ঠিক তাই। যা বলব শুনতে হবে।

উদয় হাসতে থাকে।

—হাসছেন যে।

—তোমাকে দেখলেই আমার হাসি পায়।

মধু রেগে রাঙা হয়ে ওঠে। বলে,—এই ড্রাইভার ময়দান চলো।

ড্রাইভার গাড়ী ঘুরিয়ে নেয় গড়ের মাঠের দিকে।

গুম্ হয়ে বসে থাকে মধুমতী। ওর কপাল ঘামে। খুচরো চুল উড়তে থাকে কপালের ওপর।

উদয় বলে,—হঠাৎ ফাঁকা মাঠে গিয়ে লাভটা কি হবে।

—লাভ যা হবার আমার হবে আপনার কি!

—না তাই বলছিলাম, পাগলামী করলেই ত আর সেটাকে মেনে নেয়া যায় না। গাড়ী ফেরাতে বলুন।

—বলব না।

তবে আমাকে এখানে নেমে যেতে হবে।

—বেশ যান। বাড়ী গিয়ে সায়েববাবুকে বলব মাঝ রাস্তায় একলা ফেলে চলে এসেছেন। কি অপূর্ব দায়িত্ব জ্ঞান।

—তাতে কি হবে?

—নিজেই ভেবে দেখুন না।

—চাকরীটা যাবে।

—যাবেই ত'। আর পথে দাঁড়াবেন। খেতে পাবেন না।

উদয় এবার জোরে হাসতে সুরু করে,—চাকরী যাবে, খেতে পাবো না—এতটা পর্যন্ত ভাবা হয়ে গেছে। বেশ, তাতে তোমার লাভটা কি?

—লোকসানই বা কি?

—লোকসান আছে। মনে মনে স্বীকার করো সেটা।

—কি শুনি? আমি ত' ভেবে পাচ্ছিনে।

—এমন ঝগড়া করবার আর কথায় কথায় ভয় দেখাবার সুযোগ আর পাবে কি?

—খু-উ-ব।

—কি করে?—উদয় বলে।

—কেন, আর একজনকে বহাল করা হবে। বেশ ওবিডিয়েণ্ট দেখে।

—কিন্তু সে যদি সব কথা শোনে?

—তবে ত' ভালই।

—কি করে? ঝগড়া যে হবে না।

—না হোক। তবু বেয়াদপী সইতে হবে না।

গাড়ী চৌরংগী রোড ধরে চলেছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ওপরে একখণ্ড লঘু সাদা মেঘের দিকে দৃষ্টি আটকে যায় উদয়শেখরের। গাছের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে দেখা যায় দু একটা বিলাতি কুকুর সমেত সাহেব মেম এখানে ওখানে। ঠেলাগাড়ীর ওপর কচি বাচ্চা রেখে ঝিমোচ্ছে নেপালী ঝিগুলো। তাদের দিকে হয়ত বা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ফুচ্‌কা আলু কাবুলীগুলা,—অথবা কোন মাদারী। পেতলের কলসীতে চা নিয়ে ভাড়ে বিক্রি হয় জায়গায় জায়গায়। বেশ লাগে দেখতে। মন্দ নয়।

উদয় চুপ হয়ে যায়।

মধুমতী ট্যাক্সিওলাকে বলে,—রোখো।

ট্যাক্সি থামে।

মধু উদয়ের হাত ধরে ফেলে।

উদয় চমকে ওঠে।

মধুমতীর দৃষ্টি নরম হয়ে আসে। হাতখানা ধরে চাপ দিয়ে বলে,—চলুন নামি।

উদয় হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে,—না।

—নামতে হবে।

—কি পাগলামী সুরু করেছ, উঠে এসো।

—তবে আমি একা চললুম।

মধুমতী নামতে যায় রেগে।

এবারে উদয় ওর হাত একখানা চেপে ধরে,—ভেতরে এসো।

জোর করে মধুমতী,—ছাড়ুন।

ট্যাক্সীওলা মুচকী হেসে পিছনে তাকায়।

উদয় লজ্জায় অপমানে ধমকে বলে,—উঠে এসো। ট্যাক্সি থেকে নেমে গেলে ভাড়া দিতে হবে যে! টাকা কই!

তা বটে! মধুমতীর বুদ্ধি স্থির হয়।

ভেতরে এসে বসে।

এবার ট্যাক্সিওলাকে বাড়ীর দিকে যেতে বলে উদয়।

ট্যাক্সী চলে।

মধুমতী উদয়ের কাছে সরে বসে কাঁধে হাত রাখে,—আমার ওপর রাগ করেন নি ত'?

উদয় কাঁধ থেকে হাতটা নামিয়ে দিয়ে বলে,—সভ্য হয়ে বোস।

কাঁধের ওপর ওর জামা ধরে জোরে,—আমি বেশ কোরব হাত তুলব এখান দিয়ে।

উদয় একটু বিরক্ত হয়,—কি পাগলামী হচ্ছে?

—বেশ হচ্ছে।

উদয় এবার একটু মিষ্টি করে বলে,—লক্ষ্মী মেয়ে, একটু সরে বোস।

—কাল আবার আসবেন বলুন, আমায় নিতে।

—তা কি করে বলি। তোমার সায়েববাবুও ত আসতে পারেন।

—না, আপনি আসবেন।

—চেষ্টা কোরব। কাঁধ ছাড়ো। লক্ষ্মী মেয়ে!

মধুমতী উদয়ের নরম মিষ্টি গলায় গলে পড়ে। কাঁধ ছেড়ে দেয়।

উদয় সরে বসে।

মধু বলে,—আচ্ছা, আপনি আমাকে রোজ ত বাংলা পড়াতে পারেন ?

—না।

—কেন ?

—শেষকালে কি মারা পড়তে বলো !—হাসে উদয়।

মধুর একটু অভিমান হয় যেন,—আমাকে তা হলে বেশ ভয় করেন।

—একটুও নয়। তোমার পাগলামীকে সমীহ করে চলি মাত্র।

অন্যকেউ এ কথা বললে চড় মেরে বসত মধু এতক্ষণে। কিন্তু উদয়কে কিছু বলে না। একটু অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকে মাত্র। উদয় যে ওকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করছে না প্রথম থেকে, এটা কি করে হতে পারে। তাই ভেবে মধুর অবাক লাগে।

ওরা বাড়ী পোঁছোয়।

সন্ধ্যায় কুন্তলবাবু উদয়কে খান কয়েক জরুরী চিঠির মূল কথা বলে দিচ্ছিলেন, টাইপ করে যাতে কাল সকালেই পাঠান যায়। উদয় লিখে নেয় চিঠিগুলো। ইতিমধ্যে ইন্দুমতী ঘরে আসে। ইদানীং ইন্দুমতীর শরীরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। ইন্দুমতী এটা যত স্পষ্ট টের পায় যে কুন্তলবাবুর মন থেকে সে যেন অনেক তফাতে সরে আসছে, শুধু তাই নয়, সে স্থান দখল করছে তারই নিজের বোন মধুমতী, ততই ইন্দুমতী এক আতংকিত চিন্তায় ডুবে যায়। ওর শরীর পর্য্যন্ত খারাপ হতে থাকে। বেশীর ভাগ সময়ই ত সেলাই করে বা বই পড়ে কাটায়। কুন্তলবাবুর সঙ্গে হয়ত বা কোন কোন দিন কোন কথাই হয় না। কথা বললেও তার জবাব দিতে কুন্তলবাবু নারাজ। চারটে কথার জবাব দেয় একটা অথবা চুপ করেই চলে যায়।

ঘরে ঢুকে ইন্দুমতী শুধোয় কুন্তলবাবুকে,—চা খাবে। চা করে আনব ?

কুন্তলবাবু না তাকিয়েই বলে,—না।

আজকাল ইন্দুমতীর হাতে কিছুই খেতে চায় না কুন্তলবাবু এইটেই সব চেয়ে লাগে ইন্দুমতীর। ইতিমধ্যে মধু আসে।

এসেই কুন্তলবাবুর কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে চুলের ভেতর আঙুল বোলাতে বোলাতে বলে,—কই যাবেন না আজ ডায়মণ্ড হারবারে?

—চল যাই।

ইন্দুমতী মুখ ফিরিয়ে নেয়। মধু বলে,—দিদি একটু চা দেনা সায়েববাবুকে!

কুন্তলবাবু হেসে বলে,—তোমার হাতের কফি হলে খাওয়া যায়। চা খাব না।

মধু বলে,—তবে কফিই আনছি।

ইন্দুমতী একটা বই ওলটাতে থাকে।

কুন্তলবাবু ওঠে,—আমার কফিটা ওপরের ঘরে পাঠিয়ে দিতে বোলো উদয়।

উদয় ঘাড় নাড়ে শুধু।

কুন্তলবাবু বেরিয়ে যায়।

ইন্দুমতী চুপ করে বসে বসে বইয়ের পাতা একটার পর একটা উল্টে যায়। চোখদুটো ওর পাষাণ হয়ে গেছে বুঝি। একটা অক্ষরও চোখে পড়ে না। উদয়ের সামনে এত বড় অপমান ওকে যেন বড় বেশী বিঁধেছে। সবচেয়ে দৃষ্টিকটু মধুর হাতের কফি খেতে চাওয়াটা। কুন্তলবাবুর সাধারণ জ্ঞানটুকুও লোপ পেতে বসেছে! কি এমন অপরাধ করেছে ইন্দু যে তাকে সকলের সামনে এমন অযথা অপমান করতে হবে। অথচ এমন ত' একদিন ছিল যখন ইন্দুমতীর হাতের চা কফি না হলে কুন্তলবাবুর দিনটাই খারাপ যেত। ধারণা ছিল ইন্দুমতীর

ওই ছোট্ট হাতখানাই বড় পয়া। বলত মাঝে মাঝে,—হাতখানা তোমার কেটে পকেটে করে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

বিস্ময়ে বলত' ইন্দু,—ওমা সে আবার কি! হাত কাটবে কেন?

—তোমার হাতটাই এত পয়া। ও হাতে চা খেয়ে যত কাজেই গেছি, বিফল কখনও হইনি। তোমাদের লক্ষ্মীঠাকরুণ স্বর্গে আছে কিনা জানিনে, তবে আমার ঘরে যে স্বয়ং হাজির আছেন,—এ কথা জানি।

আনন্দে আটখানা হলেও বাইরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে বোলত,—ঠাকুর দেবতা নিয়ে অমন তামাসা করতে নেই।

—তামাসা ত করছি না। যা সত্যি তাই বলছি।

—কি সত্যি?

—লক্ষ্মী ত' আমার ঘরেই আছে।

—লক্ষ্মী না ছাই। লক্ষ্মীর নীচে যেটি আছে সেটি বরং হলেও হতে পারে।

কুন্তলবাবু রেগে যায়,—দেখো অত বিনয় ভাল নয়। না হয় রূপ কিছু বা পেয়েছ, তাই বলে নিজেকে প্যাঁচার সঙ্গে তুলনা করলে তোমার অহংকারই প্রকাশ পায়।

—সত্যি বলছি আমার যদি একটু অহংকার হয়ে থাকে। আমি ত' ছাই আর্শীতে মুখই দেখি না কত দিন, আন্দাজে সিঁদুর পরি।

—কেন আর্শীর অভাব আছে?

ইন্দুমতীর মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে, বলে,—না, তা হবে কেন? আর রূপ কি হবে? তুমি ত' আর ফেলতে পারবে না?

কুন্তলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে,—একটু ভেবে বলে,—তুমি খুব সেকেলে ইন্দু, অথচ তোমার ভেতর কি যে একটা মিষ্টি কিছু

পাই যে তোমাকে ভাল না লেগে পারে না। শুধু তাইই নয়। তুমি আসবার পর আমার ব্যবসা খুব বড় হয়ে উঠেছে। মনে হয় যেন তোমার ভাগ্যে।

ইন্দু আবার লজ্জা পায় আত্ম প্রশংসায়,—ভাগ্যি না হাতী!

তারপর কুন্তলবাবু হয়ত বা বলে,—চলো কোথাও বেড়াতে যাই।

—কোথায়?

—চল না যেখানে তোমার ইচ্ছে।

—আমার ইচ্ছে কিছু নেই।

—কেন?

—বললে তুমি রাগ করবে।

—না, রাগ কোরব কেন, বলো না।

—আজ আমার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কিনা। তাই।—বড় বড় চোখ দুটো মেলে ভয়ে ভয়ে বলে ইন্দুমতী। কুন্তলবাবু হো হো করে হেসে ফেলে।

বলে,—আচ্ছা, এই ব্রত-ট্রতগুলো কোত্থেকে শিখলে বলোত'? এখানে ত' শেখাবার কেউ নেই!

—কেন, ও আবার শিখতে কষ্ট নাকি!

—তবু শুনি এই মঙ্গল চণ্ডীটা কার কাছ থেকে শিখলে?

—পরেশের মায়ের কাছে।

—পরেশ কে?

ইন্দু বিস্মিত হয়,—তাও জানো না! বাড়ীর সামনে স্যাকরাদের ছেলে, তার মা। বুড়ী মাঝে মাঝে আসে। বড় ভালো মানুষ। বলছিলো ওর এক নাতি কাজকর্ম্ম কিছু পাচ্ছে না, যদি কিছু করে দাও তুমি।

আমি! তা বটে! চাকরীর আড়ৎ খুলে বসে আছি। যাক্ সেই পরেশের মা-টি হচ্ছে তোমার ব্রত কথার গুরু।

ইন্দু একবার তাকিয়ে চোখ নামায়। ঘাড় নাড়ে।

কুন্তলবাবু বলে,—তবেতো মা-টির আসা বন্ধ করতে হবে। এই রামহরি!

চাকরকে ডাকতে যায় কুন্তলবাবু।

ইন্দু বলে,—তোমার পায়ে পড়ি। চাকর বাকরের সমেনে আর এ সব বোল না। বুড়ীর কোন দোষ নেই। আমিই বলেছিলুম।

—কেন বলোত' ?

রাঙা হয়ে ওঠে ইন্দুমতী, কোনমতে মুখ নীচু করে বলে,—বলেছিল এ ব্রত করলে একটি ছেলে হতে পারে!

অ! এবার খুব হাসতে হাসতে কুন্তলবাবু, ইন্দুমতীকে জড়িয়ে ধরতে যায়।

ইন্দুমতী একটু তফাতে গিয়ে বলে,—একটু বোস, তোমার জন্ম আজ মুগের পুলি করেছি, নিয়ে আসি।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কত কথা, কত আদর! সব আজ মনে পড়ে ইন্দুমতীর। তার মতো সুন্দরী আর নেই, তার মতো 'পয়া' আর নেই, তার মতো ঠাণ্ডা মেয়ে চোখে পড়েনি, কত কথা।

তার কত ব্যাখ্যা। বলতে গেলে ত' মহাভারত হয়ে যাবে। সেই স্বামী আজ তাকে সকলের সামনে এমন করে অবহেলা করতে পারল! চোখে জল আসতে চায়। তবু উদয়ের সামনে চেপে রাখে ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবুর এ পরিবর্ত্তন তিনটে বছর আগেই বা কে আশা করেছিলো। ইন্দুমতী স্বপ্নেও ভাবতে পারত না এই কুন্তলবাবুর সামান্ত

ব্যবহার তার মনে এত বড় আঘাত করবে। ভুল হয়েছিল ইন্দুমতীর। স্বামীকে বড় বেশী বিশ্বাস করে ফেলেছিলো। খুব বেশী আপনার বলে ভেবেছিলো। কিন্তু মানুষত' আপনার হয় না। স্বার্থ ই যে মানুষের সাধারণ ধর্ম।

ইন্দুমতী বইয়ের পাতাগুলো ওলটাতে থাকে।

বিশ্বাস করা ছাড়া ইন্দুমতীর উপায়ও ছিল না। একদিনের জন্যে তারকেশ্বর গিয়েছিল ইন্দুমতী। সেদিনের কথা কি এত শীঘ্র ভোলা যায়!

দিনটা রবিবারও নয় যে বাড়ীতে ইন্দুমতীর অনুপস্থিতি কুন্তলবাবুর অসহ্য হবে, রবিবারটা ইন্দুমতীর অন্য কোন কাজ করবার জো ত' নেই। সংসারে যেন আর কেউ নেই সেদিন ইন্দুমতীর জীবনে। রোববার কুন্তলবাবুই যেন গ্রাস করে রেখেছে। পান দাও, জল দাও, চা দাও, বিকেলে আজ এটা খাব, সেটা খাব, বোস কাছে, গান গাও গুণগুণ করে, না পারো পিঠটা চুলকে দাও, নয়ত বসে বসে গল্প করো যা খুসী আবোল তাবোল। তবু আমার কাছেই থাকতে হবে—কুন্তলবাবুর হুকুম। হুকুমই ত'! সেদিনটা ইন্দুমতীর নিজের ইচ্ছে বলে কিছুই থাকবার জো' নেই। নিজের অস্তিত্বই ভুলে যেতে হয় যেন।

তাই রোববার কোনমতেই ইন্দুমতী কোথাও যায় না। ভাবে ওঁর কষ্ট হবে। কিন্তু তাই অন্য কোন বার যেতে আর আপত্তি কি!

পাশের বাড়ির বেগম বলে মেয়েটার মায়ের সঙ্গে তারকেশ্বর গেল ইন্দুমতী। ইন্দুমতী কি তখন জানত যে বেলা বারোটার পর বাড়ী এসে সেদিন আর বেরোবে না কুন্তলবাবু! ঠিক বারোটায় কুন্তলবাবু বাড়ী এলো।

শুধোলে চাকরদের,—তোর মা কই ?

—তারকেশ্বর গেছে। বসুন, খাবেন আসুন।

কুন্তলবাবুর ভ্রূদুটো সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা চাঁদ,—কখন আসবে ?

—আঁজ্ঞে বিকেলে বোধহয়।

—সঙ্গে কে গেছে ?

—বেগমের মা,—ওই বুড়ি।

—কে বুড়ি ?

—ওই যে হোতাকে থাকে, এক বুড়ি। মাঝে মাঝে আসে মাঠারুণের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।

—বাড়ী কোনটা।

—সতেরো লম্বর,—বলে আর একটা চাকর।

কুন্তলবাবু আর কিছু না বলে ঘরে ঢোকে। একটা বই তুলে নেয় হাতে। কাত হয়ে শুয়ে পড়ে ইজি চেয়ারে। বেলা একটা বাজে, দেড়টা বাজে।

চাকর ডাকে,—বাবু খাবেন আসুন।

—বেরো ঘর থেকে, খাব না।—ধমকে ওঠে কুন্তলবাবু।

দুটো বাজে, চারটে বাজে, সাড়ে ছটার সময় ফেরে ইন্দুমতী—সঙ্গে সেই বুড়ি। দোরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল চাকরদুটো, ইন্দুমতীকে দেখতেই বলে ওঠে,—ভরদিন বাবু উপোস করে আছে।

—সে কিরে ? কখন এসেছে ?—শুধোয় ইন্দুমতী।

—বারোটায়। সেই থেকে বসে আছে ঘরে।

ইন্দু বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলে,—আপনি এখন যান দিদি।

সমস্ত দিন উপবাসে পরিশ্রমে খুবই ক্লান্ত দেখায় ইন্দুমতীকে, তার ওপর কুন্তলবাবু সমস্ত দিন খায়নি শুনে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। তবু

মনে কোথায় যেন একটু আনন্দও হয় এই ভেবে যে তার জন্যে সমস্ত দিন উপোস করে আছে একটা পুরুষ মানুষ। ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে ইন্দুমতী,—বলে, কখন এলে ?

কথা বলে না কুন্তলবাবু।

প্রসাদ বার করে বলে,—নাও প্রসাদ নাও।

কুন্তলবাবু নীরব।

—কি হোল ?—ম্লান হেসে কাছে গিয়ে বসে,—বারে বা, একটু তারকেশ্বরে গেছি আর অমনি গোঁসা !

কুন্তলবাবু সিগারেট ধরায়।

হাসতে হাসতে বলে ইন্দুমতী,—এক শিবকে তুষ্ট করে এলুম, আর এক শিব রেগে কাঁই। কি করতে হবে বলো ? পূজো কোরব ?

কুন্তলবাবুর পায়ে হাত দেয় ইন্দুমতী।

কি হচ্ছে, ছাড়ো,—বলে পা টেনে নেয় কুন্তলবাবু।

ছাড়ব না।—বলে জোর করে পাটা ধরে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে,—আচ্ছা, একটু না দেখলে থাকতে পারো না ! যদি মরে যাই !

কুন্তলবাবুর চোখদুটো যেন জলে ভাসে।

—আচ্ছা বাপু, ঘাট হয়েছে, আর শিব পূজোয় কাজ নেই আমার।

কুন্তলবাবু এবার ওঠে,—দাও, প্রসাদ দাও।

হাত পেতে প্রসাদ নেয়।

ইন্দুমতী ঠাকুরকে ভাত বাড়তে বলে।

—চলো, দুজনে বসে খাব। চলো। গলাটা জড়িয়ে ধরে ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবু একটু বাধা দেয়,—ছাড়ো।

—চলো, তুমি ছাড়া আমায় ক্ষমাই বা কে করবে বলো ?

কুন্তলবাবু উঠে পড়ে—চলো।

ইন্দুমতী আর কুন্তলবাবু সেদিন কি আনন্দে যে ভাত খেয়েছে সে কথা বলে বোঝান যাবে না! ভেবে অবাক লাগে আজকের কুন্তলবাবুর ব্যবহার দেখলে, এই সেই কুন্তলবাবু! তার স্বামী!

উদয় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে আস্তে আস্তে ডাকে,—দিদি!

ইন্দুমতীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে এই ডাকে, বলে,--কি ভাই!

—আজ আপনাকে শকুন্তলা পড়ে শোনাবো। ওরা বেরিয়ে গেলে আমরা পড়া সুরু কোরব। ইন্দুমতী একটা বড় নিশ্বাস ফেলে,—ভাল লাগে না ভাই, চুপ করে থাকতে ইচ্ছে হয়।

—না, তা চলবে না। আমার কাছে বসে পড়তে হবে। দেখবেন কি চমৎকার গল্প!

ইন্দুমতী বলে,—বেশ।

একটু চুপ করে থেকে উদয় বলে,—আমার মন যদি খারাপ হয় আমি কি করি জানেন?

—কি?

—আকাশের দিকে তাকাই। দেখবেন খুব নির্জনে আকাশের দিকে চোখ রেখে, মনে হবে, কত ছোট আমরা, আর কত বড় অনন্ত আকাশ, আর কত অনন্ত কোটি নক্ষত্র, আমাদের পৃথিবীর চেয়ে কত বড়! তখন সামান্য মানসিক দুঃখগুলো তুচ্ছ মনে হয়। ভারী আরাম লাগে। আকাশ ত দূর থেকে নীল দেখায়। কিন্তু আকাশের কি সত্যিই কোন রঙ আছে?

ইন্দুমতী ওর কথাগুলো শোনে, বড় ভাল লাগে, বলে,—না, আকাশ ত ফাঁকা, তার আবার রঙ কি?

উদয় হাসে,—ঠিক তেমনি।

এর ভেতরে মধু ঘরে ঢোকে কফি নিয়ে। উদয় বলে, ঠিক

তেমনি, আপনার এই বোনটির ওপরে কত রঙ, কত রামধনু, কিন্তু এ সব মিথ্যে আসলে কোন রঙই নেই। ফাঁকা।

মধু একটু হেসে বলে,—কবিতা হচ্ছে বুঝি? কবির সামনে এই রইল কফি! কবি আর কফি। কেমন মিলে গেল দেখলে দিদি?

উদয় বলে,—দিদি এক কাপ চা আনুন না। কফি আমি খাব না।

মধু ওর সামনে যে কফি রেখেছিলো সেটা সরিয়ে রাখে উদয়। মধুর মুখটা কালো হয়ে যায় অপমানে, ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

—কই দিদি চা আনুন?

ইন্দুমতী ওঠে,—দিচ্ছি ভাই। কিছু খাবার খাবে?

—খাব। যত পারেন নিয়ে আসুন। গরীবের ছেলে, ঘরে ত' আর জোটে না। দিদির বাড়ী যা জোটে!

ইন্দুমতীও ঘর থেকে বেরিয়ে যায় হাসতে হাসতে চা আর খাবার আনতে।

একটু পরে গাড়ী নিয়ে বেরোয় কুন্তলবাবু আর মধুমতী। আজ ইন্দুমতীকে সামনাসামনি কঠিন আঘাত করে কুন্তলবাবুর যেন আনন্দ হয়। এ এক বিচিত্র আনন্দ! খুব জোরে গাড়ী চালাতে থাকে কুন্তলবাবু। নিজেই ড্রাইভ করছে আজ। মধুমতী কুন্তলবাবুর কাঁধের ওপর দিয়ে একটা হাত তুলে দিয়ে চেপে বসে।

কুন্তলবাবু ডাকে,—মধু!

কুন্তলবাবুর গলাটা আজ কাঁপছে কেন?

মধুমতী সাড়া দেয় না।

কুন্তলবাবু ওর মুখটার কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে,—তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ মধু।

মধুমতী বলে আস্তে,—কেন?

—আমি যা চেয়েছিলাম ইন্দু তা' দিতে পারেনি, ইন্দু মানুষ নয়।

মধু নীরব।

—তুমি জানোনা। বিয়ের পর থেকেই দেখেছি, ও যেন আমাদের পৃথিবীর মানুষ হতে চায় না, স্ত্রী হয়েই থাকতে চায়। ইন্দু আদর্শ স্ত্রী, কিন্তু নিঃসন্দেহে নারী নয়। এ কথা কি জানতে?

—জানতাম। দিদিকে আমি জানি, বরাবরই পুরুষ মানুষ দেখলে ওর ভয়।

—সব পুরুষকে নয়। একজন পুরুষকে সে ভালবাসে আমি জানি।

—কে?

—সে কথা বলা যায় না।

মধুমতী তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে,—কিন্তু আপনার ভুলও হতে পারে। দিদি এমন হতে পারে না।

—প্রমাণ আছে।—একটু হাসে কুন্তলবাবু।

মধুমতী আবার চুপ করে থাকে।

বাঁ হাতে ষ্টিয়ারিং ধরে ডান হাতে মধুর হাত চেপে ধরে কুন্তলবাবু। মধুমতী বাধা দেয় না।

—তোমাকে আমি নিজের মত করে তৈরী কোরব মধু।

—আপনি কি ভালবাসেন।

—আমি নাচ ভালবাসি। তুমি উর্বশীর মত নাচবে। সবাই তোমার দিকে লোলুপ হয়ে তাকাবে। আমি দেখে হাসব। প্রেমের জীবনে এ আমার এক প্রচণ্ড সখ।

মধুমতী কথা বলে না।

গাড়ীর বেগ বাড়ে।

—তুমি কিছুই বললে না মধু!

মধুমতী কথাগুলোর ঠিক মানে ধরতে পারে না কিছুতেই। একটু ভেবে চুপ করে বলে,—কি বোলব ?

—কথা বলো, মধু, অনেক কথা বলো,—একটু আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে কুন্তলবাবু।

মধুমতী তবু চুপ করে থাকে অনেক্ষণ। শোনা যায় শুধু গাড়ীর আওয়াজ।

—আমার জীবনে কোন রস ছিল না মধু, ইন্দুর প্রেমে শুকিয়ে গেছে। ইন্দুর প্রেম আনন্দ দেয়নি আমায়, কি দিয়েছে—কিছুই না।

—কিছুই না!—মধুমতীও বিস্মিত হয় যেন,—নিজেকে ঠকাচ্ছেন না ত' সায়েব বাবু।

কুন্তলবাবু হাসে,—নিজেকে ঠকাতে চাইনে বলেই ত তোমাকে এত কাছে পেতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা আসছে না।

—যদি বলি আমার দ্বিধা আছে,—মধুমতীর স্বরও গভীর হয়ে উঠেছে।

কুন্তলবাবুর মুখখানা শুকিয়ে যায় মুহূর্তের ভেতর,—কি দ্বিধা আছে বলো ?

—বলবো না।

—তবে নিশ্চয়ই মিছে কথা বোলছ।

—মিছে কথা যে বলিনে তা নয়, কিন্তু আপনার কাছে মিছে কথা কখনও বলিনি, হয়ত বা বলবও না।

গাড়ী ঘুরে যায় একটা রাস্তার বাঁক পার হয়ে।

কুন্তলবাবু আবার বলে,—তোমার ত লাভ ছাড়া লোকসান দেখিনে!

—লোকসান দেখবার চোখ আপনার আছে কিনা পরখ করতে হয় তবে। দিদির কথাটা ভাল করে ভেবে দেখেছেন ?

—বললাম ত দেখেছি।

—না দেখেননি।

—তুমি কি বলতে চাইছো ?

—বিশেষ কিছুই নয়। তবে বিয়ের পর মেয়েদের কাছে স্বামী যে কি তা ত' জানেন না। জানলে বলতেন না এমন কথা। দিদি ত' আপনাকে সবই দেবার চেষ্টা করেছে।

—কিন্তু সে সব যে আমার কাছে কিছুই নয়। আমার তৃষ্ণা মিটল কই ?

—তৃষ্ণা কি মেটে ?

—মেটে। দু গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেলেই তৃষ্ণা মেটে।

—অনেকের ঠাণ্ডা জলে তৃষ্ণা বাড়ে।—বলে মধুমতী।

—তবে কিসে মেটে ?—কুন্তলবাবু কুটিল হাসে।

—কড়া মদে। মাতালের তৃষ্ণা জলে মিটতে চায় না।

—মানলাম। কিন্তু উপায় কি বলো, জলে যদি নাই মেটে !

—তাবলে কি নেশাটা ভাল বলতে হবে ?

—ভাল খারাপ বুঝিনে, তবে জীবনে কখনও কখনও সেটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

—সে প্রয়োজন ভাল নয়। ওটা রোগের ভেতরই ধরা যায়।

ক্রূর হাসি দেখা যায় মধুমতীর ওষ্ঠে।

সামনের মোটরের একটা তীব্র আলোয় দেখা যায় কুন্তলবাবুর ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠেছে। রাঙা হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখখানা।

কঠিন কণ্ঠে বলে,—তুমি ছেলেমানুষ মধু। তোমার সঙ্গে তর্ক করা ত চাইনে।

—আমি ত' তর্ক করছিনে। মধুমতী মাকড়সার মত, কুন্তলবাবুকে সামান্য আরশুলা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারে না। তাই ধরা যখন

পড়েছে, তখন বেশ খেলাতে ভাল লাগছে।

কুন্তলবাবু তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে বলে,—তুমি ভুল করলে মধু। এতে তোমার আর তোমার দিদির কারোই ভালো হবে না।

—কি করবেন, তাড়িয়ে দেবেন?

—মানে?

মধুমতী যেন কৌতুক করছে,—ও মাগো, দুটো সোমত্ত বোনকে তাড়িয়ে দিলে কোথায় দাঁড়াব?

—তুমি কি তামাসা কোরছ?—ভীষণ রেগে কাঁপতে থাকে কুন্তলবাবু!

মধুমতী মুখ টিপে হেসে বলে,—আহা, গাড়ীটা ঠিক করে চালাবেন যেন। হাত যেমন কাঁপছে। এ্যাক্সিডেন্ট না হয়!

কুন্তলবাবু গাড়ীটা থামায় এক অন্ধকার রাস্তার কোণে,—কি বলতে চাইছ তুমি?

মধুমতী কুন্তলবাবুর কাঁধে হাত রেখে বলে,—বলছি, রাগটা কমান মশাই। আমার ভালবাসা আর ভিক্ষে করতে হবে না। ওটা আছেই। তাছাড়া—

—তাছাড়া কি?

—তাছাড়া দিদির দোষে ত' আমি জীবন নষ্ট করতে পারিনে, আপনিও না। কি বলেন?

কথাগুলো ঠাট্টা কি সত্য ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কুন্তলবাবু। তবু এতক্ষণে মধুমতীর কথাগুলো ভাল লাগে।

গাড়ী স্টার্ট নেয় আবার।

মধুমতী কুন্তলবাবুর কাঁধে মাথাটা রেখে বলে,—আপনি যা বলেন তাই কোরব।

কুন্তলবাবু বলে,—আমি—আমি বলি তুমি খুব নাচ শেখো, তুমি শুধু নাচবে আর আমি দেখব। দেখব হাজার হাজার মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে ক্ষুধাতুর চোখে। আমার খাবার সকলের চোখে লোভ জাগাবে, এতে আমার বড় আনন্দ। এমন আনন্দ আর কিছুতেই পাইনে।

মধুমতী ধীর কণ্ঠে বলে,—তাই হবে।

এরপর থেকে অকস্মাৎ মধুমতীর নাচের দিকে ঝোঁক হয় অসম্ভব। নাচ-ছাড়া আর কিছু যেন জানেই না। নাচের মাষ্টার যেমন অবাক হয়ে যায়। মন্দ্রদেশীয় ভদ্রলোকের পুঁজি ফুরিয়ে যেতে চায়। মধুমতীর নৃত্য ঝঙ্কারে মুখর হয়ে থাকে প্রাসাদের প্রতিটি সন্ধ্যা।

কুন্তলবাবু দেখে সিগারেট ধরিয়ে একটু অল্প অল্প হাসে।

সারেঙ্গী আর তবলা, সেতার আর ঢোলক। মধুমতীর সুগোল পা দুখানির নরম আলতো আঘাতে পরিষ্কার কাণে আসে তালে তালে ঘুঙুরের রেশ। মধুমতীর স্নায়ুতে আগুন ধরে যেন।

মধুমতী এতদিনে ওর আবেগ প্রকাশের এক পথ খুঁজে পায়। দেহের দোলায়মান ভঙ্গীমায় সামনের দর্শকদের বুক কাঁপে থর থর করে, বুঝি বা উর্ব্বশীই নেমে এলো স্বর্গের সভা থেকে।

কাজল পরা চোখের অব্যর্থ ইসারা নৃত্যের গভীর ভাষা প্রকাশ করে দেয়। ইসারার এক মূল্যবান মানে হয়। যেমন বলে, শুধু এমন একজোড়া চোখ থাকলেই যে কোন নাচিয়ে নিজেকে ধন্য মনে কোরত। আরও আছে। দেহের প্রতিটি ঢেউ যেন নাচের দোলা লাগায় দর্শকের প্রাণে। মঞ্চের ওপর মধুমতীর সে রূপ দেখলে সত্যিই চমক লাগে। রঙীন আলোর স্পর্শে হয়ত বা বাসন্তিকা নৃত্যে মর্ত্যেও বসন্তরাণী জাগে।

বসন্তের মৃদু বাতাস অবশেষে ঝড়ের বেগ আনে। গলার মালা ছিড়ে যায়। ঘুঙুরের সুতীব্র জলদ্ আওয়াজ। আর মধুমতীর ঘাগরার ঘূর্ণায়মান ঝলক! নেশা ধরে যায় দর্শকদের। ওড়না উড়ে যায়,

খুলে যায় কবরীর বাঁধন। নৃত্য শেষে বিপুল হাততালি আর বাহবা!

মধুমতী পথ পেয়েছে।

ইন্দুমতী দেখতে আসে, দেখতে আসে কুন্তলবাবু আর তার বান্ধবরা।

নৃত্যের শেষে দর্শকদের হাততালি আর উচ্ছ্বাসে কুন্তলবাবু গর্ব অনুভব করে। মৃদু মৃদু হেসে সিগারেট ধরিয়ে যায় গ্রীনরুমের দিকে। নৃত্যবেশ পরা মধুমতীকে তুলে নেয় নিজের গাড়ীতে। চলে যায় কোথায়!

ইন্দুমতী একাই বাড়ী যায় চাকরের সঙ্গে শীতে কাঁপতে কাঁপতে, বা গ্রীষ্মে ঘামতে ঘামতে। এসে হয়ত দেখে তখনও উদয়ের ঘরে আলো জ্বলছে। উদয় নাচ দেখতে যায় না। বহুবার বললেও যায় না।

ইন্দুমতী উদয়ের ঘরে ঢুকে দেখে সে বসে বসে লিখছে তখনও, তার মা ঘুমুচ্ছে এক পাশে।

ইন্দুমতী ওর পাশে গিয়ে নীরবে বসে। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে উদয় তাকায়, হাতের কলম রেখে বলে একটু হেসে,—নাচ হয়ে গেল দিদি?

—ইন্দুমতীর মুখখানা শুকনো, বলে,—তুমি কি লিখছ ভাই?

উদয় একটু ইতস্তত করে বলে,—একটা গল্প লিখছিলাম দিদি।

—কি গল্প?

—এ ভারী মজার গল্প। শুনবে?

—শেষ করেছ লিখে?

—না, গল্পের স্বামীটিকে এখনও বউটির সঙ্গে মেলাতে পারিনি।

—তোমার গল্পে কি শেষকালে স্বামী স্ত্রী মিলেছে?

—হ্যাঁ। আমি ট্র্যাজেডি ভালবাসি না দিদি।

—কেন?

—ট্র্যাজেডি লেখা অত্যন্ত সহজ, আর পাঠকের চোখের জল ফেলিয়ে বাহবা পাওয়া তার চেয়েও সহজ। কিন্তু সত্যিকারের কমেডি লেখা অত্যন্ত শক্ত। লিখতে পারলে পাঠককে জীবনের বিকাশের দিকে অনেকটা এগিয়ে দেয়া হয়।

—ঠিক বুঝলুম না ভাই!

—তার মানে, একটা জীবনের হতাশা বা মৃত্যুতেই ত' ট্র্যাজেডী, সেটা পড়ে পাঠকের মনেও একটা হতাশার মত ভাব আসে, তার নিজের জীবনের ট্র্যাজেডীর আশংকায় সে কাঁদে। কিছু কমেডীতে লোকে ঠিক শুধু আনন্দটুকু পায়, হতাশার পরিবর্তে আশাবাদী করে তোলে পাঠককে। জীবনের সফলতায় বিশ্বাসবান হয়। তাই কমেডি অনেক ভাল।

ইন্দুমতী বলে,—কিন্তু সংসারে সত্যিই ত' আর সব স্বামী স্ত্রী মিলে যায় না।

—আশাবাদী হলেই মিলে যায়। আশাতেই তাকে চেষ্টা করায় মিলনের।—উদয়ের চোখের ভেতর জলন্ত বিশ্বাস দেখে ইন্দুমতী।

—তুমি ঠিক বোলছ ভাই?

—হ্যাঁ, এ আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি দিদি।

ইন্দুমতী নীরবে থাকে। উদয় কলমটা নিয়ে কপালে ঠুকতে ঠুকতে আবার তাকায় ইন্দুমতীর দিকে। ইন্দুমতী বলে,—একজনের মন যদি না-ই পাওয়া যায় তবে কি করা উচিত ভাই?

ইন্দুমতী যেন ভেঙে পড়েছে। আজ উদয়ের কাছে এমন কথা বলতেও তার বাধে না। ভাবে যদি উদয় কোন সমাধান করতে পারে এর।

উদয় যেন ডুবে যায় নিজের ভেতর গভীর চিন্তায়, ধীরে ধীরে আস্তে

বলে,—মন যদি নাই পাওয়া যায়, চেষ্টা করেও যদি মনের নাগাল না মেলে, তবে চুপ করে দেখাই ভাল। হয়ত কখনও সেই এক-জনের মনের পরিবর্ত্তন আসতে পারে।

নিশ্চেষ্ট দর্শক!

এ কি করে সম্ভব? ইন্দুমতী বলে,—তবু যদি পরিবর্ত্তন না হয়!

তখন চুপ করেই চলে যেতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় ত' দেখিনে। মিছে কথা বাড়িয়ে কামড়া কামড়ি করে মনের নাগাল মেলে না দিদি, তাতে অশান্তিই বাড়ে শুধু।

ইন্দুমতী চুপ করে থাকে।

সামনের মোমবাতিটা প্রায় নিভে আসে। বিজলী আলো থাকা সত্ত্বেও উদয় মোমবাতি জ্বালিয়ে লেখে।

হঠাৎ শুধোয় ইন্দুমতী,—আচ্ছা, তুমি মোমবাতি জ্বালাও কেন? আলো ত' রয়েছে!

উদয় একটু হাসে,—মোমবাতিটার ক্ষয়ে যাওয়ার সঙ্গে নিজের জীবনের ও মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত ক্ষয়ে যাওয়ার একটা মিল আছে, তাই এইটাই ভাল লাগে। এই দেখুন মোমবাতিটা কত ক্ষয়ে গেল, তার মানে, আমার জীবনের অনেকগুলো মুহূর্ত ক্ষয়ে গেল দিদি!

ইন্দুমতী উদয়ের অদ্ভুত চিন্তায় অবাক হয় এবার একটু।

শুধোয়,—খাবে না?

—হ্যাঁ, ওই খাবার ঢাকা আছে, যখন ইচ্ছে খাব। পাশে ঢাকা খাবার আঙ্গুল দিয়ে দেখায় উদয়।

—কি রান্না হোল?

—মা, জানে। বোধ হয় তরকারি ভাত।

—তুমি বোস, আমি ভাতটা বেড়ে দিয়ে যাই। তারপর ভেতরে

গিয়ে মাছ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—এখন খাবনা দিদি।

ইন্দুমতী যেন ধমক দেয়—যা বলছি শোন, আর বেশী রাত কোরনা। বোস।

উদয় হাসতে হাসতে উঠে বসে একটা আসনে। ইন্দুমতী তার সামনে ভাত তরকারী আর ডাল দিয়ে ভেতরে যাবার আগে বলে, —আস্তে আস্তে খাও। মাছ আনছি।

উঁদয় খেতে থাকে।

ইন্দুমতী সামনে বসে বলে,—আচ্ছা ভাই একটা কথা শুধোই, দিদির কাছে সত্যি বলবে কিন্তু, তুমি কখনও কাউকে ভালবাসনি।

উদয় একটু হেসে বলে,—হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন দিদি?

—এমনিই।

—কি রকম ভালবাসা বলছেন?

—তার মানে?—অবাক হয় ইন্দুমতী।

—মানে বলছিলাম কি,—আপনি কি কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলছেন?

ইন্দুমতী বলে,—হ্যাঁ।

উদয় বলে,—দেখুন দিদি প্রেম প্রত্যেকরই নিজের ভেতর থাকে। নিজের প্রেমবোধ যখন প্রকাশ পায়, তখন সেটা কোন একটি বস্তুকে আশ্রয় করতে চায়। কোন মেয়েকেই আশ্রয় করতে চাক বা কোন ঠাকুরকেই চাক। আসলে প্রেম তার নিজের। বুঝলেন না বোধহয়?

—ঠিক বুঝলাম না।

—ধরুন আমার ভেতরে একটি আলো আছে, সেটি এতদিন ঢাকা ছিল। হঠাৎ খুলে যেতেই সে আলো দেখে নিজেই চমকে

উঠলাম, এত আলো আমার, এত প্রেম আমার! তারপর সে আলো ফেললাম কোন মেয়ের ওপর, সে আলোকিত হোল। সে প্রেমে সিক্ত হোল।

ইন্দুমতী গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—এ আলোর দুয়ার কি সকলেরই ভাঙে?

—না ভাঙে না। আপনি ঠিক ধরেছেন। সাধারণ সংসারে যে প্রেম দেখেন, সেটা প্রাণের আলো নয়। অন্ধকারের প্রাণ। তাতে প্রচণ্ড লোভ থাকে, থাকে সর্বগ্রাসী আঁধারের ক্ষুধা। ওটা ঠিক উল্টো।

—বুঝলাম এবার।

—এমনি এক ক্ষুধার পাল্লায় একবার পড়েছিলাম।

ইন্দুমতী বলে,—কি করে সে গ্রাস থেকে পরিত্রাণ পেলে?

—সে এক মজার ব্যাপার।—হাসতে হাসতে বলে উদয়,—তখন কতই বা বয়েস! সতেরো-টতেরো হবে। এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পড়াশুনো করতাম ম্যাট্রিক দেবার আগে। ওদের বাড়ীরই এক ভাড়াটের মেয়ে,—নাম ধরে নিন বেগম। মেয়েটার বয়েসই বা তখন কত হবে এই ধরুন পনেরো। কিন্তু পাকা মেয়ে। কি না বোঝে সে! প্রেম বোঝে, পুরুষ বোঝে, সংসার বোঝে। সবজান্তা আর কি! সত্যি দিদি মেয়েরা এত ছোট বয়েসে সবজান্তা হয়ে ওঠে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ইন্দুমতী হাসে,—তা' সত্যি!

—তারপর সেই বেগমের বাদশা হবার চেষ্টা হোল আর কি! কি ছেলেমানুষী কি বোলব দিদি। সে খিদে যেন মেটে না। শুধু ইচ্ছে হয় তাকে কি করে কাছে পাব, কি করে লুকিয়ে একটু দেখব। যত পাই—ততই যেন চাই। সে এক ভীষণ ফ্যাসাদ। বেগম হয়ত বললে,—মা ওঘরে আছেন? বলি,—রেখে দাও তোমার

মা আর বাবা। কাছে এসো। জোর করে টেনে আনি। মানে একেবারে অন্ধ। চারদিকের কোন জ্ঞান নেই। শুধু খাই খাই ভাব!

হাসতে থাকে উদয়।

ইন্দুমতীও হাসে,—তারপর?

তারপর সব আকাশ কুসুম। তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। তোমার চোখদুটো তোমার মুখখানি আমার কাছে না পেলে আমি মারা যাব। চলো দুজনে চলে যাই। অন্য কোথাও। কটকে কি এলাহাবাদে। সেখানে একটা ঘর-টর ভাড়া নিয়ে থাকা যাবে। মেয়েটাও একটু যেন রাজী। রাতে ঘুম নেই, দিনে খাওয়া নেই। পড়া মাথায় উঠেছে, সে এক হৈ হৈ ব্যাপার!

ইন্দুমতী উদয়ের বলবার ধরনে হেসে বলে,—তারপর?

—তারপর শেষটা একটা ধমক মাত্র। মেয়েটির দাদা টের পেলো। আমার বন্ধুকে ডেকে বললে আমায় ওদের বাড়ী আর না যেতে। তার বোনের সঙ্গে আর কখনও কথা বলতে দেখলে সে নাকি আমায় উত্তম মধ্যম দেবার বন্দোবস্ত করবে।

—তুমি ছেড়ে চলে এলে?

উদয় হাসে,—তা আর আসব না। তবে কি বলছেন পিঠের চামড়াখানা খুলে রেখে আসব ওখানে? তার ওপর আবার শুনেছিলাম মেয়েটার দাদা ওপাড়ার নামকরা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক।

—তারপর তোমার কি হোল?

—খুব কষ্ট হোল। অন্ধকারে সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে এমন একটা ভাব। মারা যাই আরকি! শরীর খারাপ হয়ে গেল। পড়াশুনোয় খুব মন দিয়ে কিছুটা ভোলবার চেষ্টা করলাম। কি দিনই গেছে দিদি! একে বয়স অল্প। তার

ওপর দাগাটাও কম নয়। শরীর ঝিম্ ঝিম্ কোরত। পেটে হজম হোত না। আর দুশ্চিন্তার বোঝা যেন মাথায়।

—তখন কি করলে?

—তখন একটি জিনিষ আমাকে বাঁচালে!

—কি?

—এই লেখা। লিখতে লিখতে ভারী আরাম পেতাম। মনের সব অন্ধকারগুলো যেন কেটে যেত। স্বচ্ছ হয়ে যেত মনের আকাশ। সেই থেকেই ত' লিখি।

এবার হাত ঝেড়ে পাত থেকে উঠতে যায় উদয়।

ইন্দুমতী বলে,—সবগুলো মাছ খেলে না ত'?

—আপনার স্নেহের পরিমাণটা যদি মাছের পরিমাণের সঙ্গে সমান করতে চান তবে ত' আমি অপারগ। খান পাঁচেক মাছ মানুষ খেতে পারে?

—খুব পারে।

উদয়কে অবশেষে মাছ কটা সব খেয়ে উঠতে হয়।

ইন্দুমতী বলে,—সরো, এবার এঁটোটা ফেলে দিয়ে যাই।

—না থাক। আমি ফেলবখন।

—আমি থাকতে তুমি ফেলতে যাবে! আমার চোখের আড়ালে যাহয় করো। চোখের সামনে করতে পাবে না।

উদয়ের এঁটো ফেলে হাত ধুয়ে ইন্দুমতী আবার ঘরে আসে।

বলে,—তোমার বিছানা কোথায়?

—কেন?

পেতে দিয়ে যাই।

উদয় এবার ঘোরতর আপত্তি জানায়,—থাকগে, আমি পেতে

নেবো খ'ন। আপনি যান কুন্তলবাবুর হয়ত খিদে পেয়েছে, কতক্ষণ এখানে বসে আছেন।

ইন্দুমতী হাসে,—সে ভয় নেই।

—কেন ?

—সে ত' নাচ দেখে ফেরেনি এখনও।

—নাচ শেষ হয়নি ?

—অনেক্ষণ শেষ হয়েছে।

—তবে ?

—ওরা তারপর বেড়াতে গেছে।

—কোথায় ?

—যেখানে বেশ ভাল লাগে।—ম্লান হাসি ইন্দুমতীর মুখে।

উদয় বিস্মিত হয় বইকি,—ওরা কারা ?

ইন্দুমতী খুব তাচ্ছিল্য করে বলতে চাইলেও গলাটা কাঁপে,—ওই ত' সে আর মধু! একটু বেড়িয়ে ঘুরে বাসায় আসবে।

উদয় বোকার মত প্রশ্ন করে বসে,—আপনাকে বেড়াতে নিলে না কেন ?

ইন্দুমতীর মুখটা মুহূর্তে সাদা হয়ে যায়। পরক্ষণেই কথাটা পালটে নেবার জন্যে বলে,—কে জানে ? আচ্ছা, এবার তোমার বিছানাটা কোথায় বলো।

উদয় মুখটা নীচু করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আঙুল দিয়ে বিছানাটা দেখিয়ে দেয়।

ইন্দুমতী চাদর ঝেড়ে পরিষ্কার করে বিছানাটা পাততে থাকে।

বলে,—চাদরটা কি ময়লাই করেছ ভাই, তুমি বড় নোংরা।

উদয় হাসে।

ইন্দু বলে,—কাল সকালে চাদরটা নিতে চাকর পাঠাব। দিয়ে দিও।

কেন কি করবেন?

—তোমার মাথা কোরব। কাচতে হবে না? না কাচলে এত ময়লায় শোয়া যায়!

বিছানা পাতা প্রায় শেষ হয়।

—নাও এবার শুয়ে পড়ো। আমি পালাই।—বলেও দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দুমতী।

উদয় বোঝে যে একা একা ওপর তলায় যেতে মোটেই ভাল লাগছে না মধুমতীর।

হঠাৎ ইন্দুমতী বলে,—আচ্ছা। লেখাটা আমায় শিখিয়ে দিতে পারো!

উদয় সজোরে হেসে ওঠে,—লেখা আবার শেখাব কি করে?

—কিন্তু কলম ধরলে আমার লেখা আসে না!

—কি আসে?

—কান্না আসে।

হো হো করে হেসে ওঠে উদয়। ইন্দুমতীও হাসে,—সত্যি বলছি তাই। দু লাইন লিখতে যদি কেউ বলে আমার ভীষণ কান্না পাবে। লেখা-টেখা একদম ভাল লাগে না।

উদয় বলে,—তবে কি ভাল লাগে আপনার?

—বলোত, কি?

—আমি বলতে পারি। খুব ভাল ভাল খাবার তৈরী করতে, রান্না করতে আর সেগুলো রাস্তার মানুষকে ভাই বলে কাছে ডেকে নিয়ে খাওয়াতে।

ইন্দুমতীর গলা কাঁপে,—সে আর পারলুম কই। রাস্তার মানুষকে ভাই বলে ঘরে এনে খাওয়াতে এ জীবনে আর পারলুম না। সত্যি কথা বলছি ভাই। কি কষ্ট যে হয় যখন দেখি ঘরের দোর থেকে লোক এসে ভাত চেয়ে ফিরে যায়। ভাত দিতে পারি নে। স্বাধীন ত' নই। তোমার সাহেব বাবু বকতে সুরু করবে। কি কষ্ট যে হয়! ওই ভয়ে বারান্দায় দাঁড়াইনে। পাছে আমার কাছে কোন ভিখিরী কিছু চেয়ে বসে। দিতে না পারলে বুক ফেটে যায়।—বলতে বলতে ইন্দুমতী কেঁদে ফেলে।

উদয়শেখর বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। এই ত' আমাদের দেশের সত্যিকারের মা-বোন। বুক-ভরা প্রেম নিয়ে এত হতভাগা দেশে জন্মে চিরটা কাল কেঁদেই কাটাল।

উদয় বিচলিত হয়ে ওঠে,—দিদি! কি বলবো আর—

ইন্দুমতী প্রাণ থেকে শুধোয় যেন,—এর কি কোন শেষ নেই ভাই। কেন যে মানুষ উপোস করে থাকে, খেতে পায় না। আমি ত' কিছুই বুঝিনে!

উদয়শেখর গম্ভীর হয়ে ওঠে,—আপনার প্রশ্নর উত্তর জানাটা খুব সহজ নয় দিদি।

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা যায়। কুন্তলবাবু আর মধুমতী বাড়ী ফিরেছে।

ইন্দুমতী ত্রস্ত্য হয়ে ওঠে, বলে,—যাই ভাই।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

পাঁচ ছ'শ দর্শককে মুক-মুর্খ বানিয়ে মধুমতী যখন চলে যায় নাচতে-নাচতে সেলাম জানাতে জানাতে তখনও দর্শকদের মন মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

দলে দলে মানুষ যায়। একজন যায় না। উদয়।

উদয় আজ পর্যন্ত যায়নি কোথাও ওর নাচ দেখতে।

মধুমতী সগর্বে ভেবেছে লোকের মুখে শুনে যাবেই। কিন্তু কই যায় না ত'!

সেদিন নিউ এম্পায়ারে নাচবার কথা। কুন্তলবাবুর সঙ্গে বেরোবার আগে মধুমতী নীচে নেমে আসে উদয়ের ঘরের সামনে। ঘরে ঢুকে উদয়ের মাকে শুধোয়,—উদয়বাবু কোথায়?

—ওই রান্নাঘরে। ছেলে বললে শোনে না, ভিজে কয়লায় কখনও উনুন ধরে, ও জোর করে ধরাবে।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখে উদয় উনুনে ফুঁ দিচ্ছে।

—শুনছেন?

ফুঁ দিতে দিতেই উদয় মুখ না ফিরিয়ে বলে,—শুনছি।

—আজ আমার সঙ্গে যাবেন? উনুন না হয় এসে ধরাবেন।—হাসতে হাসতে বলে মধুমতী।

তেমনি ভাবেই জবাব দেয় উদয়।—তোমার সঙ্গে না গেলে বাঁচব কিন্তু ভাত না খেলে ত' বাঁচব না। কাজেই এটাই আগে দরকার।

—মুখ তুলুন না?

—কি?—উদয় এবার ফিরে দাঁড়ায়।

—বাইরে আসুন, বড় ধোঁয়া।

উদয় ওর সঙ্গে বাইরে আসে।

একটু বেশ হুকুমের সুরে মুচকী হাসতে হাসতে বলে মধুমতী,—কাপড় জামা ছেড়ে নিন।

—না।—পরিষ্কার বলে উদয়।

—আপনি যাবেন না আমার সঙ্গে ?—একটু যেন অভিমান মধুমতীর কণ্ঠে।

তবু উদয় বলে,—না!

—কতবার কত ফাংশনে নিমন্ত্রণ করেছি, একদিনও ত' যাননি!

—যাবার প্রয়োজন মনে করিনি।

—কেন আমার জানা উচিত।

—নাচ ত' বাড়ীতেই দেখছি, তোমার চলা বলা সবই নাচতে নাচতে, কাজেই ও আর নোতুন করে কি দেখব!

—তার মানে সোজা কথা হিংসে হয় আপনার।

—হয়। এইভেবে হয় যে কত গাড়োল তোমার নাচ দেখবার জন্যে প্রাণ তুচ্ছ করে দেয়, আর আমি তাও পারলাম না।

মধুমতী এবার বেশ চটেছে,—না, যারা দেখতে যায় তারা জিনিষের কদর বোঝে বলে যায়। অবিশ্যি সকলে ত' সব জিনিষের কদর বোঝে না। কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না।

—তেমনি ভেজাল ঘি হলে মানুষের পেট গরম হয়, ত' কুকুরের ত' হবেই।—হাসে উদয়।

মধুমতী রেগে বলে,—তাহলে আপনি যাবেন না ?

উদয় এতক্ষণে মজা পায়, মৃদু হেসে বলে,—এবার বোধহয় নটরাজ খেপে যাবে, নাচ সুরু হবে ?

—আপনি যাবেন কি না বলুন !—মধুমতীর মুখ কালো হয়ে যায়।

উদয় আস্তে আস্তে এবার বলে,—আচ্ছা, আমি যাই বা না যাই তা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা: কেন? আমি ত' আর একটা এমন কিছু মানুষ নই।

—মানুষ! আপনাকে আবার মানুষ বলে মনে করি নাকি! নেহাৎ বাড়ীতে আছেন। একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। তাই শুধোলাম। না যাবেন ত' বয়ে গেল! আপনি কি ভেবেছেন আপনি না গেলে আমার কিছু আসে যাবে? রান্না করুনগে, তার চেয়ে বড় কাজ ত' আপনার নেই।

মধুমতী ভয়ানক রেগে যায়।

উদয় হাসতে থাকে। বলে,—খুব বকতে পারো। অবশ্য ওগুলো বেরিয়ে যাওয়াই ভালো!

মধুমতী ভীষণ রেগেছে,—আমায় তুমি বলছেন কোন সাহসে?

—তুমি আমার চেয়ে বয়সে ত' অনেক ছোট। আমার আটাশ, তোমার উনিশ। তোমাকে কি করে আর আপনি বলি।!

—আমার সঙ্গে কথা বলবেন না আর। কথা বললে দেখাব মজা এবার।

দুম দুম করে চলে যায় মধুমতী।

উদয় খুব খানিকটা হাসতে থাকে।

মা বলে,—তোর সকলের পেছনে লেগে থাকা অভ্যেস? মনিবের বাড়ীর মেয়ে তার সঙ্গে অমন করে কথা বলে!

উদয় হাসে,—তুমি জানো না মা, ও সব চেয়ে পছন্দ করে এই রকম কথা! এতে ওর ভালও হবে। আদর আর তোষামোদে যার চোখ বুজে আছে, ঘা খেলেই তার চোখ খুলবে দেখো।

রাত তখন সাড়ে বারোটা। উদয় মোমবাতি জ্বালিয়ে লিখছিলো তখনও সমস্ত বাড়ীটা নিঝুম, কেউই বোধহয় বাড়ী নেই। সবাই গেছে মধুমতীর নাচ দেখতে। উদয় একমনে বসে ছিল কলম হাতে।

পেছন থেকে ঝুপ করে ওর কোলের ওপর একটা মালা পড়ে।

চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে উদয় নাচের পোষাকেই রঙ মাখা মুখে মধুমতী পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

উদয় একটু গম্ভীর হয়ে বলে,—এটার মানে?

—মানে, বড়লোক দর্শকরা দিলে নাচ দেখে খুসী হয়ে মালাগুলো। —হাসে মধুমতী,—বাব্বা! কি রাগ আপনার। সন্ধ্যেবেলা একটু ঝগড়া হয়েছে কি না হয়েছে! আচ্ছা ভদ্রলোকদের মালাগুলোর বদলে আমার বোধ হয় কিছু দেয়া উচিত ছিল, না? অন্তত একটু হাসি বা একটু—

উদয় বলে,—উচিত ছিল দেয়া পাদুকা। যারা এমন গাধা যে তোমার নাচ দেখে মালা দেয় পাদুকা পাবার যোগ্যতাও বোধহয় তাদের নেই।

মধুমতী হাসতে থাকে খিল খিল করে,—উঃ! আমাকে যে কি কড়া কথা আপনি বলেন! অন্য কেউ হলে কোন্‌দিন যে কি হয়ে যেত! কিন্তু আপনার কথাগুলো যে কি করে সহ্য করি নিজে ভেবে নিজেই অবাক হই। আপনার কড়া কথা শুনলে রাগ হয় নিজের ওপর, স্ফূর্তি বলছি!

সরে আসতে চায় মধু উদয়ের কাছে।

উদয় বলে,—ওই দেখ, কুন্তলবাবু দেখে ফেললে!

মধু দরজার কাছে চলে যায় মুহূর্তে। তারপর ফিরে এসে বলে,— কই না ত'?

উদয় মৃদু হেসে বলে,—ওরা সর্ব্বদাই তোমার মনের ভেতরে আসছে, যাচ্ছে। ওরা যখন তোমার মন থেকে সরে যাবে, তখন এসো, এখনও সময় হয়নি।

মধুর রাগ হয় এই ভেবে যে উদয় ঠিক ধরে ফেলেছে তার দুর্বলতা সবটুকু। কুন্তলবাবুও যে তাকে কি চোখে দেখে সে জানে। কুন্তল বাবুকে মন থেকে এড়ান অত্যন্ত শক্ত হয়ে পড়ছে দিন দিন। যা বলা যায়, তাই শোনে। যা চাওয়া যায় তাই দেয়। এমন ভাল মানুষকে ত' কিছু বলাও যায় না! কুন্তলবাবুকে নিয়ে হয়েছে মধুর জ্বালা।

উদয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মধু।

কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ে। উদয়ের খোঁচা টুকু নীরবে হজম করতে পারে না। ওর সত্যিই কেমন বিশ্রী লাগে আজ। কুন্তলবাবুর ব্যাপারটা ক্রমশঃ যে পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটা নিজে ত ও টের পাচ্ছে স্পষ্ট করে আজকাল।

কুন্তলবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কের হালকা মাধুর্য্যটুকুর অন্য রকম মানে দাঁড়াচ্ছে দিন দিন, তবু সে কুন্তলবাবুকে বলতে পারেনা কিছু। কিন্তু এ-যে অন্যায়, এ বোধ বোধহয় মধুমতীর আছে। কুন্তলবাবু তাকে যে স্বাচ্ছন্দ যে বিলাসের ভেতর ডুবিয়ে রেখেছে, সেই লোভেই কি সে বলতে পারবে না কিছু! আর্থিক এত স্বাচ্ছল্য, আর অপব্যয়ের এত তীব্র নেশা—দুটোই যে মধুমতীর বড় ভাল লাগে। সংযমের লাগাম তার জীবনের বেগকে রোধ করতে পারে না। তাই যেদিক দিয়ে সে যায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবার সম্ভাবনা সে দিকে।

মধুমতী গভীর চিন্তায় ডোবে আজ অকস্মাৎ। চিন্তা করা মধুমতীর স্বভাব নয়। তবু উদয়ের সংস্পর্শে সে এমন তীব্র এক একটা চাবুকের

মত আঘাত পায়,—যেটা সরাসরি চেতনায় গিয়ে লাগে। চৈতন্য হয়ত হয়নি, তবু কিছু ভাবতে পারছে আজ মধুমতী উদয়ের ইঙ্গিতের নগ্ন রূঢ়তায়।

সত্যিই এ তার কি স্বভাব? যেটা সে চায়, সেটা যে তাকে পেতেই হবে এমন কোন গোঁয়াতুর্মীর মনোভাব ত' তার থাকা উচিত নয়। তাতে পেতে গিয়ে যে পরিণাম ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়, তার দামও বড় কম নয়।

আজ তার সঙ্গে কুন্তলবাবুর সম্পর্ক, বিশেষ করে গত মাস থেকে যে ধারায় এগিয়ে চলেছে, এতে সে লাভ করবে এক ধনীর অর্থ অপব্যয়ের বিলাসিতার অধিকার, লাভ করবে বহু ধনীর আর মেকী মার্জিত সমাজের যুবকদের। কিন্তু ক্ষতি?

ক্ষতি হবে আর একদিকে। তার চিরকালের নিরীহ দিদি ইন্দুমতীকে হারাতে হবে। তার বুকে অসহনীয় আঘাত করতে হবে। আঘাত ত' করেই চলেছে, আরও আঘাত করবার প্রয়োজন হতে পারে। এই বা সে কি করে সয়।

সইতেও বা পারে! দিদিকে কি সে ভালবাসে? তার স্বভাবে ভালবাসা বলে কোন নরম ভাবের অনুভূতি ত' সে আছে বলে জানে। সে দিদিকে ভালবাসে কিনা ঠিক বলতে পারে না। হয়ত বা না। বরং শৈশব থেকে দিদির সুস্বভাব আর নম্রতার জন্যে দিদিকে হিংসে করে এসেছে। বাবা দিদিকে বেশী ভালবাসতেন, সবাই দিদির প্রশংসা করত, এ যেন শৈশব থেকেই ওর অসহ্য হোত। সে জানত দিদি ভাল। কিন্তু দিদি এত ভাল না হলে বোধহয় ভাল হোত?

প্রথম সে যখন শুনল কুন্তলবাবুর কাছে যে দিদির ভালমানুষী আর স্বভাবের নম্রতা তার ভাল লাগে না, তখন ওর আনন্দই

হয়েছিল। তারপর ক্রমশ ও বুঝল যে দিদির এই অতিরিক্ত সৎভাবই তাকে কুন্তলবাবুর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। তখন মধুমতী—কুন্তলবাবুর কি ভাল লাগে, তাই লক্ষ্য করে দেখল, তার স্বভাবই ভাল লাগে কুন্তলবাবুর। একথা কুন্তলবাবুও বহুবার বলেছে তাকে। তখন দিদির ওপর আশৈশব ঈর্ষার প্রতিশোধ চরিতার্থ করবার একটা অদৃশ্য বৃত্তি তার ভেতর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কুন্তলবাবু প্রশ্রয় পেল মধুমতীর কাছ থেকে।

কিন্তু তবু এতটা ভাবেনি মধুমতী। ভেবেছিল শুধু হয়ত বা আঘাত করেই আনন্দ পাবে। তার যে আবার কোন পরিণতি থাকতে পারে একথা কে ভেবেছিল। আর কে ভেবেছিল যে ওই দরিদ্র ছোঁড়াটা উদয় ওর মনকে এমন ভাবে ধীরে ধীরে বশ করে ফেলবে।

উদয়ের সম্বন্ধে ওর দুর্ব্বলতা দেখে ও নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আর নয়। আর এ দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। উদয়কে আঘাত করবার সময় এসেছে। কুন্তলবাবুকে দিয়েই এবার আঘাত করাতে হবে।

তা না হয় হোল, কিন্তু কুন্তলবাবুর সমস্যার ত' সমাধান করতে কিছুতেই পারছে না মধুমতী। বিশেষ করে দিন দশেক আগে কুন্তলবাবুর যে দুর্ব্বল মনের পরিচয় সে পেয়েছে তাতে সে অবাক হয়েছে, হয়ত বা তাতেই সে একটু চিন্তান্বিত হয়েছে।

কুন্তলবাবু সেদিন কথাটা বলে ফেলল পরিষ্কার করে,—তোমাকে ছাড়তে পারব না।

সেদিন বৃষ্টি পড়ছিল একটু একটু। মেঘঘন আকাশের গায়ে একটু আলোর বিন্দুও নেই। রাস্তা অন্ধকার। গাড়ীর ভেতর অন্ধকার। ড্রাইভার নিথর হয়ে বসে গাড়ী চালাচ্ছে। পেছনে কুন্তলবাবু আর

মধুমতী। মধুমতীকে নাচের পোষাকে, চোখের কাজলে আর ঠোঁটের লালে বাঈজীর মতই দেখাচ্ছিল সেদিন। কুন্তলবাবু ওর পাশে,—মধু, তোমার কাছে যা পেয়েছি আমি, এ ছাড়বার মত সাধ্য আমার নেই।

মধুমতী চুপ করেই থাকে, তবু কুন্তলবাবুর আজকের সুস্পষ্ট লজ্জাহীনতায় ওরও একটু কেমন যেন লাগে। কুন্তলবাবু সমস্ত আবেগ ঢেলে দিয়ে বলে,—তুমি আর আমাকে ঠকিও না মধু। তোমাকে পেলেই আমি সব পেলাম। বল তুমি আমার কাছে থাকবে?

—আমাকে পনেরো দিন ভাববার সময় দিন।—বলে মধুমতী।

—বেশ, পনেরো দিন পরে আবার আমরা সন্ধ্যায় এমনি করে বেড়াতে বেরোব। সেদিন তোমার কথা তুমি বোল।

মধুমতী আর কথা বলে না।

ওর মন তখন উধাও হয়েছে আর একজায়গায়। এক তীব্র দ্বন্দ্বের ভেতরে ডুবে গেছে মধুমতী; কি করবে সে? কুন্তলবাবুর চাহিদা মেটাতে গেলে জীবনের সব মধুই তার উজাড় হয়ে যাবে সে জানে। কুন্তলবাবু তাকে বিয়েই কি করতে চায়? তাহলেও দুটো জীবন নষ্ট হবে। তার নিজের জীবন ত' নষ্ট হবেই, তাছাড়া দিদির জীবন আর কুন্তলবাবুর জীবন দুটোই নষ্ট হবে। আর উদয়?

উদয়ের জন্যেই কি তার জীবন নষ্ট হবে? মনের কোথা থেকে যেন কে বলে ওঠে—হ্যাঁ। উদয় তাকে পারে বাঁচাতে। উদয়কে যে সে ভালবাসে একথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। আবার স্বীকার করবারই বা উপায় কই! উদয়ের নির্বিকার ভাবটা যেন কিছুতেই সইতে পারে না। উদয় যদি একটু নীচু হোত, তবে মধুমতী উদয়কে সব সমর্পন করতেও দ্বিধা কোরত না। কিন্তু উদয় সে দিকেই যাবে না। কাটাকাটা কথা, তাচ্ছিল্য, কোন কোন সময়

ঘৃণা, ঠাট্টা মধুমতীকে জ্বালিয়ে দেয়।

তবু উদয়ের জন্যে ওর মনের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। ও নিজেই টের পেয়ে চমকে ওঠে। সেই নরম জায়গাটায় ঘা পড়ে। মধুমতীর চোখ জ্বালা করে, গা জ্বালা করে, তবু মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত ফোঁস ফোঁস করেও ছোবল্ দিতে পারে না। বিশেষ করে উদয় যখন দিদিকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তাকে সকলের সামনে তাচ্ছিল্য করে, সেইটে তার সব চেয়ে বেশী বাধে, তার কি কিছুই নেই উদয়ের মনকে আচ্ছন্ন করবার মত। নেই কি জলন্ত যৌবন, আগুন ধরান চোখ। এতে কেন উদয় ভোলে না? লোকটার কি মন আছে, না মনের বদলে একটা পাষাণ আছে!

সেও তবে দেখে নেবে। কুন্তলবাবুকে দিয়ে উদয়কে দিদিকে দুজনকেই জব্দ করবে। দুটোই তার শত্রু। দুটোই যেন তার রূপ যৌবনকে বিদ্রূপ করে চলে। রূপগর্বিতা ইন্দুমতীর মনে এইটেই সবচেয়ে বেশী ঘা দেয়।

ও স্থির করে, তবে কুন্তলবাবুকেই তার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। নিদারুণ ঈর্ষায় আর অপমানের জ্বালায় মধুমতী আরও একবার জ্বলে ওঠে। এ সুযোগ হারাবে না মধুমতী। কুন্তলবাবু তার জীবনকে সফল করতে নাই বা পারল, তার ঈর্ষা আর প্রতিশোধকে সফল করে তুলবে। ভারী আনন্দ লাগে মধুমতীর।

উদয় কি জানেনা যে উদয়কে দিয়ে মধুমতী তার পা টেপাতে পারে, যা খুসী তাই করতে পারে! উদয়কে যেকোন মুহূর্তে বাড়ী থেকে বার করে দিতে পারে। উদয়কে যখন খুসী তার নিজের চাকর হিসেবে বহাল করতে পারে। এগুলো যে সে করছে না, সেটা তার উদয়ের ওপর করুণা। তবু লোকটার দেমাক দেখলে

হাসি পায়।

তেমনি হয়েছে দিদি, এই ছেলেটার সঙ্গে দিনরাত্রি গুজ্‌গুজ ফুসফুস। দিদিকেও সে সহজে ছাড়বে না। দিদির ধমকগুলো তার আজও মনে আছে। সতী সাবিত্রী সেজে বসলেই যে জীবনকে উপভোগ করা যায় না, এ শিক্ষা দিদির হওয়া উচিত। এ শিক্ষা দিদিকে দেবে। প্রয়োজন হলে বাড়ী থেকে বার করে দিতেও দ্বিধা করবে না।

ইন্দুমতীর গোমর বেরোবে এতদিনে। মধুমতীকে সে চেনে না।

মধুমতীর মনের গৌরব, রূপের ঔজ্জ্বল্য যে এত ঘৃণা করবার জিনিষ নয় সেটা ইন্দুমতীর মত সাবিত্রীকে সে হাড়ে হাড়ে শেখাবে।

রাগে জ্বলতে থাকে মধুমতী।

কিন্তু এর পরিণাম ?

পরিণাম ত' ভাবতে পারা যায় না। ভাবতে পারছে না মধুমতী। পরিণাম, উদয় চিরদিনের মত চলে যাবে। দিদি কোন আশ্রমে গিয়ে থাকবে আর সে কুন্তলবাবুর টাকার পাহাড়ের ওপর বসে দিন কাটাবে।

কিন্তু কুন্তলবাবু যদি কোনদিন ওকে তাড়িয়ে দেয় ?

তখন তার নিজের পথ নিজের দেখে নিতে হবে। হয়তবা একটা মাস্টারী বা কোন অফিসের কাজ বা যে কোন একটা কিছু করলেই হবে,. নিজের পেটের জন্যে ভাববার কিছু নেই। মধুমতী সব দিকটাই ভেবে নেয়।

তবু তার ভাবনার কোথায় কোথায় ফাঁক আছে সেগুলো ধরবার চেষ্টা করে।

কিন্তু পারে না।

কি করে পারবে ? ওর সব ভাবনাটাই যে এক চোখো হয়ে

উঠেছে। কুন্তলবাবু যে তার কাছে ধরা পড়ে গেছে এই অহংকারটাই যে তাকে অন্ধকারের ভেতর ফেলে দিয়েছে, এটা সে বুঝবে কেমন করে।

তবু আবার ভাবে যদি কুন্তলবাবু তাকে বিয়ে করতে না চায়? তবে সে কি করবে? রক্ষিতার মত রাখতে চায় যদি।

এবার ঘৃণায় শিউরে ওঠে মধুমতী।

ছি, ছি, এতখানি নামতে সে পারবে না।

উদয় হাসবে, দিদি হাসবে, লোকে ঘৃণা করবে, সমাজ দূর করে দেবে। না, না, সে কিছুতেই হতে দেবে না। চরিত্রটাকে এতখানি খেলো করবার শিক্ষা সে তার বাবা, দিদি কারো কাছ থেকে পায়নি। এই খানেই তার মন তিক্ত হয়ে বিঁধিয়ে ওঠে।

মধুমতীর গায়ে কাঁটা দেয়।

এত সাহস হবে কুন্তলবাবুর! তা বোধহয় হবে না। বিয়ে করা এক আর অ-সমাজিক একটা সম্পর্ক আর এক।

বিয়ে স্ত্রীর বোনকে করা চলে। এতে কিছুমাত্র দোষও দেয়া যায় না কাউকে। কিন্তু বিয়ে ছাড়া আর কিছু? সে হবে না। মধুমতী বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে না খেয়ে মরবে, তবু এমন সর্বনাশ নিজের হতে দেবে না।

কুন্তলবাবুর কাছে এগিয়ে মধুমতী এবার বলতে চেষ্টা করে কিছু, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। শুধু একটু কাশির শব্দ বেরোল।

কুন্তলবাবু বললে,—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ।—বলেও বলতে পারছে না মধুমতী। কেমন করে সে শুধোবে কুন্তলবাবুকে একথা। কি করে বলবে যে সে মধুকে বিয়ে করবে কি না? আজ প্রথম যেন মধুমতীর হাত কাঁপছে। নাকের

পাতা ফুলছে দ্রুত নিশ্বাসে। পায়ের পাতা হাতের পাতা ঘামছে। কাণে কিছু শুনতে পাচ্ছে না ভাল করে।

কুন্তলবাবু যেন বুঝতে পারে ওর অবস্থাটা। একটু যেন সাহস দিয়ে বলে,—বলো না। কি বলবে।

—আপনি আমাকে নিয়ে...মানে কি করে...

—কি করে মানে ?

—বলছিলাম আমাদের বিয়ে তাহলে কবে হবে ?

কুন্তলবাবু অম্লান মুখে বলে,—তুমি যেদিন বলবে।

—তাহলে বিয়ে করবেন। কিন্তু বিয়ে হবে কোথায় ?

—কেন বাড়ীতে।

—কি করে ?

—পুরুত ডেকে।

দিদির সামনে তার সঙ্গে কুন্তলবাবুর বিয়ে ভাবতেও গা কাঁপে মধুমতীর। দিদিকে সে চিরদিন ভয় করেছে শ্রদ্ধা করেছে। দিদির এতবড় অপমান চোখের সামনে সে কি করে সইবে ? দিদির মুখটা তখন কি রকম হবে ভাবতেও মধুমতীর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে। হয়ত দিদি কিছুই বলবে না। দিদির মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। শুধু একটু ম্লান হাসবে হয়ত।

মধুমতী কি তখন ঠিক থাকতে পারবে ?

তাছাড়া উদয় ?

ওর সামনে কুন্তলবাবুর সঙ্গে টোপর পরে বিয়ে! চোখে অন্ধকার দেখছে মধুমতী। মধুমতী কি তখন স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে। হয়ত পা কাঁপবে ওর, চোখের পাতা নেমে আসবে আপনা থেকে ঘামবে হয়ত পায়ের তালু? কি করে মধু স্থির থাকবে তখন ?

তারপর যদি উদয় ওর দিকে তাকায়!

কি থাকবে সে দৃষ্টিতে?

ঘৃণা?

ঘৃণাই ত'! এ ছাড়া তখন উদয়ের কাছে ওর আর কোন প্রাপ্যই ত' থাকবে না। উদয় যে জাতের ছেলে, এ জাতের ছেলে সংসারে বড় একটা দেখেনি মধুমতী, এরা ভাঙে তবু মচকায় না। এদের নীতি বোধকে চোখের ইশারায় ধুলো করে দিতে পারবে না মধুমতী। মধুমতী বৃথাই চেষ্টা করবে উদয়কে আঘাত করতে। তার প্রতিআঘাতের জন্যে প্রস্তুত হয়েই করা উচিত। সে যদি উদয়ের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাকে চাকর বানিয়ে নিজের পা টেপায়, তাতেও হার মধুমতীরই হবে। উদয় হাসতে হাসতে পা টিপবে অন্তরে বিষাক্ত ঘৃণা নিয়ে। তাতেও উদয়ের মন বেঁকান যাবে না।

তবু চেষ্টা মধুমতীকে করতেই হবে। কার অহংকার সত্য যাচাই করে দেখবার সময় এসেছে। উদয়ও অহংকারী, মধুমতীও গর্বিতা। কিন্তু দুজনের গর্ব একেবারেই উলটো। উদয়ের অহংকার তার নীতিতে, তার প্রাণের সত্যে। মধুমতীর গর্ব তার যৌবনে, তার অপরূপ দেহের ভংগীমায়। একটি পাষাণের মত কঠিন, একটি কাঁচের মত ভংগুর। একটি অটল সত্য, আর একটি টলায়মান তরংগের মত মিথ্যে। একথা কি মধুমতীও জানে না। মধুমতীও জানে তিরিশ বছর পরে তার গর্বের রূপ লাবণ্য যৌবন কিছুই থাকবে না। কিন্তু উদয়ের গভীর সত্যদৃষ্টি আরও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে। আর এ কথা জানে বলেই মধুমতীর এত ঈর্ষা এই লোকটার ওপর।

তবু উদয়কে ও ভয় করে। ওর সামনে বিয়ে কিছুতেই চলবে না।

বলে মধুমতী,—বাড়ীতে কিন্তু অসুবিধে হবে।

—কি অসুবিধে ?

—অনেক, মানে…। মধুমতী ঠিক করে গুছিয়ে বলতে পারে না।

—কাকে তোমার ভয়।

—ভয় আবার কাকে !

—দিদির ভয় কোরছ ?

মধুমতী ঠোঁট উলটোয়,—কি যে বলেন ! দিদিকে আবার ভয় করি নাকি !

—তবে ?

—না, কিছু নয়। তবু বাড়ীতে…

—কেন আমরা কি কোন পাপ করছি।

—না, তা নয়।

—লোকের সামনে সাহস নিয়ে যদি কিছু করতে না পারলাম, তবে সেটা কি করে সত্য হয়ে উঠবে। তোমার এ ভয় কেন বলোত' ?

মধুমতী ভাবে, ঠিকই ত'। ভয় আবার কাকে। সে ত' আর কিছু পাপ করছে না। কাউকেই ভয় করবার দরকার নেই। উদয়কেও নয়। তবু সাহস আসতে চায় না। উদয়ের মুখটা মনে পড়তেই একটু ভয় ভয় করে।

বলে মধুমতী,—বলছিলাম কি কোন গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

—কেন ?

—কি জানি কেন ? কোন চেচামেচী নয়। নীরবে গোপনে দুজন দুজনকে এক করে নেব। দুজন দুজনকে জানবার চেনবার অবসর পাব উৎসবে। তাই উৎসবে বেশী মানুষ না থাকাই ভাল।

মধুমতী কথাগুলো বলে একটু কাব্যের রঙ চড়িয়ে।

কুন্তলবাবু বলে,—বেশ, তাই হবে।

—সময় ত' মোটে পনেরো দিন।

—পনেরো দিনটা খুব সামান্য নয় মধু! পনেরো দিনে পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যায়। মানুষের মন উলটে যেতেও বেশী সময় লাগে না। পনেরো দিনে মনের পরিবর্তন আসতেও পারে।

—কার ?

—তোমার। সেই ত আমার ভয়।

মধুমতী হাসে,—আশ্বস্ত হোন মশাই। অত ভয় করবার কিছু নেই। এতগুলো বছর যখন কেটেছে। পনেরো দিনও এই মন নিয়েই কাটবে। ভয় নিজের মনকে নিয়েই নিজে করুন।

কুন্তলবাবু হাসে,—আমার মনটা পাষাণের মত, পনেরো দিনে তাতে দাগ পড়ে না। এ কথা তোমার দিদিই বলে থাকে।

দিদির উল্লেখে আবার অন্য মনস্ক হয়ে ওঠে মধুমতী।

কুন্তলবাবু বলে,—চলো এবার বাড়ী ফিরি।

—চলুন।

—কাল আবার আমরা বেরোব ?

—না, পনেরো দিন পরে।

—বেশ দেখা যাবে।—হাসতে থাকে কুন্তলবাবু। বিজয়ের হাসি।

পরদিন থেকে কেন কে জানে মধুমতী দিদির সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারে না। আর পাঁচদিন পরে তাকে বলতে হবে শেষ কথা।

মধুমতী স্থির করেছে একটা কিছু। পাশ ফিরে এবার ঘুমোবার চেষ্টা করে মধুমতী চিন্তার কিছু একটা সমাধান করে।

এ পাশের ঘরে ইন্দুমতীর আজ ঘুম নেই। ইন্দুমতীর পাশের আর

একখানা ছোট খাটে কুন্তলবাবুও কি জেগে আছে ?

ইন্দুমতী পাশ ফিরে কুন্তলবাবুর দিকে চোখ রাখে অন্ধকারে। বোঝা যায় না ঘুমিয়েছে কি না! আজ কতদিন হয়ে গেল কুন্তলবাবু একটা কথাও বলে না ওর সঙ্গে। আঘাতের পর আঘাত সয়ে সয়ে তবু স্থির হয়ে আছে ইন্দুমতী। ও জানে যে অন্যায় ও কিছু করেনি, তাই অন্যায় যে করছে সে নিজের অন্যায় বুঝবেই একদিন। সত্য যা, তার প্রকাশ অবধারিত।

সে ত' কোন দোষই করেনি! স্বামীর অমানুষিক পাশবিক ভোগেচ্ছার উপাদান সে কি করে হতে পারে। নীতি বলে একটা কথা ত' আছে, সংযমই যদি না রইল, নীতির বাঁধন যদি না রইল একটুও, তবে মানুষ আর পশুতে তফাত কোথায় ? ভোগেচ্ছারও একটা সীমারেখা টানতে হয় মানুষের। যেই সেটা স্বেচ্ছাচারে দাঁড়ায়, তার ফল ভাল হয় না, একথা ইন্দুমতী নিশ্চিত জানে। স্বামীকে স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে, আসুরিক ইচ্ছা থেকে বাঁচাবার জন্যে যদি এ ক্ষতি তার স্বীকার করতে হয়, তা করতেই হবে। তবু জেনেশুনে একজনকে—যাকে সে জীবনের একমাত্র পুরুষ বলে গ্রহণ করেছে, বিনাশের পথে ঠেলে দিতে পারে না। তবু সে ত' তাকে রোধ করতে পারল না।

সেই সুতীব্র ঘৃণিত লালসার উপাদান হোল তারই নিজের বোন! এই-ই ইন্দুমতীর মনে সবচেয়ে বেশী লাগে। স্বামী যদি অন্য কোন রমণীকে নিয়ে বা অন্য কোন ভাবে স্বেচ্ছাচার করত' জোর করেই হয়ত সে আটকাত ; কিন্তু এখন সে কি করে আটকাবে ?

ইন্দুমতী বিনিদ্র চোখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে। কুন্তলবাবুকে সে ভালবাসে। ভালবাসে তার স্বামীকে। পাশের খাটে কুন্তলবাবুর

দিকে আর একবার তাকায় ইন্দুমতী। ঘুমিয়েছে বোধ হয়।

কিন্তু কুন্তলবাবু ঘুমোয়নি।

ইন্দুমতী আলোটা জ্বালে। কুন্তলবাবু চোখ বুঁজে ঘুমের ভাণ করে পড়ে থাকে। ইন্দুমতী ধীরে ধীরে কুন্তলবাবুর খাটের কাছে এগিয়ে যায়। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ ঘুমন্ত কুন্তলবাবুকে জাগাবার অধিকারও ইন্দুমতীর হয়ত বা নেই! অনেকক্ষণ ভাল করে দেখে ইন্দুমতী। আজ সাত বছর ধরে একেই মনে প্রাণে ভালবেসে এসেছে, একি সে কথা বোঝে? শুধুমাত্র ভালবাসার মর্য্যাদা কি কখনও দিয়েছে তাকে। ইন্দুমতীর ভালবাসার পরিশুদ্ধ ভার গ্রহণ করবার মত ক্ষমতাও এর নেই! তাই কি? কুন্তলবাবু কি বিয়ে করে ভালোবাসা চেয়েছিলো, না বাসনা চরিতার্থ করবার কোন পাত্র চেয়েছিলো? কেন কুন্তলবাবু বুঝল না যে পৃথিবীতে হয়ত সবচেয়ে ইন্দুমতীই তাকে ভালবাসে।

কুন্তলবাবুর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বড় বড় কয়েক ফোঁটা জল পড়ে ইন্দুমতীর চোখ বেয়ে কুন্তলবাবুর গালের ওপর। একবার মুখখানি জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয় ইন্দুমতীর। প্রাণের কথা জানাতে ইচ্ছে হয়! কিন্তু থাক! একটু এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে আসে সে।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে আবার আলোটা নিবিয়ে। অন্ধকারে কে জানে ইন্দুমতী আরও কাঁদে কিনা! কুন্তলবাবু বুঝতে পারে না সেটা। শুধু আলো নেভাবার পরে নিজের গাল থেকে ইন্দুমতীর চোখের জলের ফোঁটা মুছে ফেলে।

একটু বিস্মিতই হয় কুন্তলবাবু। ইন্দুমতী কাঁদছে!

এতদিন যা ভেবে এসেছে, তা যেন একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার ভুল ত' বড় একটা হয় না। ব্যবসাদার কুন্তলবাবু জীবনে

একটা ভুলই করেছে, সেটা ইন্দুমতীকে বিয়ে করা—আর ভুলত' কিছু করেছে বলে মনে হয় না। তবে ওই চিঠিখানার মানে কি, যে চিঠিখানা পেয়েছিলো কুন্তলবাবু উদয়ের ফেরত দেয়া বইয়ের ভেতর—যেটা এখনও সে রেখে দিয়েছে নিজের ব্যাগে।

এতদিন ইন্দুমতীর কাছ থেকে মানসিক কতকগুলো বাস্তব ধর্মের খোরাক না পেয়েও কুন্তলবাবু তাকে ভালবেসে এসেছিলো, ক্ষমা করেছিলো। কিন্তু মন ভেঙে গেল ওই একটুকরো চিঠিতে। তাহলে ইন্দুমতী তাকে ভালও বাসে না, কারণ অন্য কারো সঙ্গে তার পত্র বিনিময়ও চলছে? অনেক ক্ষমা কুন্তলবাবু করেছে, কিন্তু কুন্তলবাবুরও সহ্যেও একটা সীমা আছে। এতখানি ক্ষমা করা যায় না; আবার এই ব্যাপার নিয়ে ইন্দুমতীকে কিছু বলাও যায় না, কেন না ভালবাসা ভিক্ষে করা কুন্তলবাবুর ধাতে সইবে না। ইন্দুমতী যদি অন্য কাউকে ভালবাসে বাসুক! কুন্তলবাবু তাই নিয়ে চীৎকার করে জোর করে ভিক্ষে করে ভালবাসা আদায় করতে যাবে না। এটুকু সম্মান জ্ঞান ওর আজও আছে।

তাই জৈবিক প্রয়োজনে জীবনে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু কুন্তলবাবুর মধুমতীর কাছ থেকেই পেতে হবে। এজন্যে মধুমতীকে জীবনের মত বাঁধবার প্রয়োজনও হতে পারে। তা সে করবে; কেন না এতে ইন্দুমতীর কিছু আসে যাবে না, বরং ইন্দুমতী তার প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাবার সুযোগ পাবে। তাই যাক। কুন্তলবাবুর পথ সে নিজেই ঠিক করে নিয়েছে।

তবু ওই নিরিহ ইন্দুমতীর জন্যে বুকের কোথায় যেন একটু দুর্বলতা আজও রয়ে গেছে। কুন্তলবাবু বোধ হয় সত্যিই ভালবাসত ইন্দুমতীকে। তাইত ওর হরিণীর মত ভীরু কালো চোখদুটো দেখেই বিয়ে করতে

পেরেছিল ওকে। ওর দিকে তাকালে আজও মায়া লাগে, রাগ হয় না, বেদনা পায়।

বিশেষ আজ রাত্রের ইন্দুমতীর চোখের জল কুন্তলবাবুর দুর্বল স্থানেই কি পড়েছে? কুন্তলবাবু একটু অবাক হোল। এমন ত কথা ছিল না। গোপনে তাকে দেখতে দেখতে ইন্দুর নীরব অশ্রুপাত। এ ব্যথা কিসের?

কুন্তলবাবু ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ভাবে, দেখা যাক। শেষ কোথায়?

ভোর হয়। সবাই উঠে যায়। উদয় তখনও ওঠেনি। ও একটু বেশী রাত্রে ঘুমোয়, ওঠে বেলায়।

হঠাৎ আজ সকাল বেলায়ই তার ঘরে মধুমতী ঢোকে। ওর মাকে শুধোয়,—উদয়বাবু ওঠেনি ঘুম থেকে ?

—না, মা। ও বড় বেলায় ঘুম থেকে ওঠে।

সোজা বিছানার কাছে চলে যায় মধুমতী। যদিও সেটা নিতান্ত ভদ্রতার বাইরে।

গিয়ে উদয়কে ঠেলা মারে জোরে,—এই ওঠো।

উদয় ঘুমের চোখেই বলে,—ধ্যেৎ! কে ? যাও এখান থেকে।

মনে মনে বলে মধুমতী,—কে তা দেখছি আজ।

আবার ঠেলা মেরে মুখে বলে,—শিগগির ওঠো। ওঠো বলছি।

ওর ধমকের সুরে উদয় চোখ মেলে, চোখ মেলে ওকে দেখেই একটু অবাক হয় তারপর সামনে গিয়ে উঠে বসে চোখ কচলায়।

—শিগগির ওঠো, হাত মুখ ধুয়ে এসো।—হুকুম করে যেন মধুমতী, ওর গলার বেশ বিশেষ ধরনের একটা জোর লক্ষ্য করে উদয় একটু চিন্তা করে, কি ব্যাপার ? ভোর বেলা এসে ধাক্কা! আবার তুমি বলছে! বেশ হুকুমের সুরে কথা বলছে!

ব্যাপারটা ঠিক না বুঝলেও উদয় চটে না, একটু মৃদু হেসে বলে,—কি ব্যাপার! সকালেই যে প্রলয় নাচন সুরু হোল।

—সুরু হয়নি, হবে। পরশু রেলওয়ের স্টেজে আমার নাচ আছে, যাবে দেখতে ?

অকস্মাৎ উদয়কে 'তুমি' বলে কেন ডাকতে সুরু কোরল মধুমতী উদয় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তবু একটু তামাসার স্বরেই বলে—না। ভোরে নাচ, রাত্রে নাচ দুবেলা সইবে না।

—কিন্তু যেতে তোমাকে হবে। শুধু যাওয়া নয়, বাজার থেকে ভাল ঘুঙুর কিনে আনতে হবে আজ দুপুরে। আমার পায়ের মাপ নিয়ে যেতে হবে। আরও অনেক কিছু করতে হবে।

—আস্তে—আস্তে! উদয় এবার বোঝে যে-মধুমতীর কথাগুলোর পেছতে কোন উষ্ণ শক্তি আছে। বলে,—আস্তে বলো। অতগুলো একসঙ্গে বললে পেবে উঠব না। কি বললে, ঠিক করে ভাবতে দাও, তোমার পা নিয়ে বাজারে গিয়ে বাজার মেপে—

খিল খিল করে হেসে ওঠে মধুমতী,—কি বোকা! পা নিয়ে বাজারে আবার যাবে কি করে?

—তবে কি বাজার থেকে পা কিনে আনতে হবে?

এবারে হাসতে হাসতে কুঁজো হয়ে উদয়ের বিছানার ওপর বসে পড়ে মধুমতী, তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে,—ঠাট্টা নয়। আমি যা বলব, তাই করতে হবে।

—যদি না করি।

—চাকরী খতম করে দোব।

এতক্ষণে উদয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে কিছু,—কিন্তু চাকরী ত তোমার কাছ থেকে নিইনি।

মধুমতী হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না,—তা না নিলেই বা। যা বলছি তাই করতে হবে।

—কোরব না।—উদয়ের মুখে তবু মৃদু হাসি।

মধুমতী বলে,—তবে চলো, সায়েবাবু তোমায় ডাকছে ওপরে!

—চটেছে মধুমতী, বিছানা থেকে উঠে পড়ে বলে,—গেট আপ্ !

—শোন, শোন, ঘুঙুর বাঁধতে গিয়ে যদি তোমার পা ধরে টানতে সুরু করি ! ও চাকরী কি আমার পোষাবে ? ও সব নাচের ব্যাপার ভাল বুঝি না।

মধুমতী বলে,—আমার কাছ থেকে শিখে নেবে ?

—মাথায় যদি না ঢোকে।

মধুমতী বলে,—তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করতে পারব না। যা বললুম তাই করতে হবে। সায়েব বাবুর অর্ডার।

উদয় এবার বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বলে,—দেখি সায়েব বাবুর সঙ্গে কথা বলে।

এবার ব্যাপারটা সব বুঝতে পেরেছে উদয়।

সেইদিন তুপুরেই কুন্তলবাবু তাকে আস্তে আস্তে বলে,—চিঠিপত্রের কাজগুলো আমিই কোরব। তুমি মধুর কতকগুলো জরুরী কাজ আছে সেইগুলো বরং করো।

উদয় কথা বলে না। ঘর থেকে চলে যায়।

তুপুরে ঘুঙুর কিনতে তাকে যেতে হয়। পায়ের মাপ নেবার জন্যে ও মধুমতীর কাছে যায়, ভাবে, দেখাই যাক না। কতদূর গড়ায়। ইন্দুমতী আর মধুমতী বসেছিলো।

উদয়কে দেখে ইন্দুমতী বলে,—কি ভাই ?

—ঘুঙুর কেনবার চাকরী পেয়েছি দিদি !

—সে আবার কি !

মধুমতী বলে,—হ্যাঁ, আমার কাজ করবে এবার থেকে ও।

ইন্দুমতীর মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে। কথার জবাব দেয় না।

মধু বলে,—নাও পায়ের মাপটা নাও।

বলে পা দুখানা বাড়িয়ে দেয় সাড়ীটা একটু তুলে।

উদয় কিছু বলবার আগেই ইন্দুমতী বলে, ছি মধু! ও কথা বলতে আছে। নিজের মাপ নিজে দাও।

—নাও মাপ নেবে।—মধুমতীর গা এলিয়ে দেয় কৌচে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে।

ইন্দুমতী হাতের সেলাই নিয়ে ঘর থেকে উঠে চলে যায়।

মধুমতী তেমনি ওপরের দিকে তাকিয়েই বলে, কি হোল, পায়ের মাপটা নিয়ে নাও। আঙ্গুল মেপে নাও।

সাড়া নেই উদয়ের।

কই! যা বলছি—বলে রেগে চোখ ফেরাতেই দেখে উদয় ঘরে নেই। অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে। মধুমতী এটা আন্দাজ করেছিলো, সুন্দরী মেয়ের ফরসা নরম পা টিপে আরাম পাবার লোক উদয় নয় মধু এ কথা জানে; তবু যা বলেছে উদয়কে এই-ই যথেষ্ট। মুচকী হেসে ও গানের খাতা নিয়ে বসে।

দিন তিনেক পরে মধুমতীর নৃত্য রেলওয়ে ষ্টেজে। উদয়কে দুবার তাগাদা করে যায় মধুমতী,—রেডি হয়ে থেকো! ঠিক ছটায় বেরোব। সায়েব বাবু পৌনে ছটায় গাড়ী নিতে আসবে।

উদয় হাসে। কথা বলে না।

ঠিক ছটায় মধুমতীর সঙ্গে বেরোতে হয়। যাবার পথে ওর নাচের পোষাকের ছোট চামড়ার বাক্সটি মধুমতী উদয়ের হাতে দেয়।—নিয়ে চলো।

উদয় হাতে নেয় বাক্স।

ষ্টেজে এসে ওরা পৌঁছোয়। উদয়কে মধুমতী ওর পোষাক পরবার ঘরে ডাকে।—বার করো ঘাগরা আর জামা।

উদয় বাক্স খোলে। বার করে দেয়।

মধুমতী ঘাগরা আর জামাটা নিয়ে বলে,—ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

উদয় নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরোতে যায়।

—একেবারে চলে যাবে না। দোরের পাশে থেকো। ডাকলে আসবে।

উদয় তাকায় মধুমতীর দিকে, এক বিন্দু রাগও ওর হয় না। খুব হাসতে ইচ্ছে হয় শুধু। তবু জোর করে হাসি চেপে দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়।

মধুমতী ঘাগরা কাঁচুলী আর ওড়না পরে কিছুক্ষণ পর ডাকে,—ভেতরে এসো।

উদয় ভেতরে আসে। এসে নর্ত্তকীর বেসে দেখে ওর চোখে একটু

ভালও লাগে মেয়েটাকে।

মধুমতী শুধোয়,—কেমন মানিয়েছে?

—বিশ্রী।

মধুমতীর মুখটা রাঙা হয়ে ওঠে,—কেন, বিশ্রীটা কোথায় দেখলে?

—মেয়েদের এই রূপটা আমি পছন্দ করিনে।

—কেন?

—ওটা বিকারেরই নামান্তর।

—বড় বড় কথা বুঝলাম না। সোজা করে বলো।

উদয় হাসে,—মানেটা খুবই সোজা। এ রূপ দেখলে মেয়েরা যে মা এই কথাই ভুলে যেতে হয়।

—মেয়েরা কি শুধুই মা?

—শুধুই মা, এ ছাড়া তাদের আর কোন পরিচয় আমি স্বীকার করিনে।

—তোমার কথাও আমি স্বীকার করিনে। এই সব বাজে কথা বলেই তোমরা মেয়েদের বেঁধে রেখেছো ভেতরে। তাদের সন্তান ধারনের একটা বোঝা মাত্র করে তুলেছো, তাদের নিজেদের যে অস্তিত্ব আছে,—এটাও তারা ভুলে যেতে বসেছে।

উদয় বলে,—তোমার লেকচারটি ভালই লাগল। নাচের চেয়ে একটা নারী সমিতি খুলে বক্তৃতা করলে নাম হোত বেশী। পরিশ্রমও কম হোত।

মধুমতী কিন্তু খুব গম্ভীর হয়েই বলে,—ঠাট্টা কোর না। মেয়েদের অন্য পরিচয় জানাবার চেষ্টা করো। তাতে ঠকবে না।

—জেনে ঠকেছি। আর তোমার কথাটা এতই ফাঁকা যে ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না।

—তোমরা এই সব ধোঁকা দিয়ে মেয়েদের জীবনকে নষ্ট করছো।

—জীবন কথাটা বড় বিরাট। তার মানে জানো!

—মানে তাদের জীবনে উপভোগ সুখ এসব বাতিল করে দেয়াটা ঠিক নয়।

—উপভোগ কি?

—জীবন।

—জীবন উপভোগ ত' সত্যিকারের মা হলেই করা যায়।

—হ্যাঁ, তাত' বটেই। দুদিনে কতকগুলো সন্তানের মা হয়ে বয়েসের ধর্মকে চেপে মারা।

—তর্ক করতে চাইনে। তোমার মনের রঙ যেদিন ধুয়ে যাবে সেদিনই কথাটা ভাল করে বুঝতে পারবে। আজ তর্ক করে বোঝাতে পারব না।

স্টেজে যাবার সময় হয়ে আসে।

মধুমতী বলে,—দিলে ত' চটিয়ে। আজকের নাচ কিছুতেই ভাল হবে না।

উদয় হাসে।

মধুমতী বলে,—কি পোষাক তোমার পছন্দ হয় শুনি?

—যেমন ছিলে তেমনিই ত' ভাল। আবার ঘাগরা টাগরাগুলো পরবার কি দরকার ছিল?

মধুমতী এগোতে থাকে, তারপর হঠাৎ বলে,—তোমার কথাই বা শুনব কেন শুনি? আমার যেমন খুসী আমি পরব। তোমার পছন্দ অপছন্দে আমার বয়ে গেল।

—আমি ত' তোমাকে আমার কথা শুনতে বলছি না। যেমন তোমার ভাল লাগে তেমনিই করো। আমার ভাল লাগে না এই

বলেছি মাত্র।

—তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমার পেছনে লেগে কি লাভটা হয় বলো ত'। আমি কি করেছি তোমার?

গলাটা মধুমতীর ধরে আসে। অকস্মাৎ এ স্বর পরিবর্তন খুবই বিস্ময়ের।

তবু উদয় স্থির কণ্ঠেই বলে,—আমি ত' তোমাকে কিছু বলিনি।

—বলেছোই ত'। সবসময় আছো, কি করে আমায় ঘা' মারবে।

উদয় গম্ভীর হয়ে বলে,—কে, আমি, না তুমি? কে ঘা মারে?

—আমার সবই খারাপ। আমার পোষাক খারাপ, আমার কথা খারাপ, আমার স্বভাব খারাপ। কিছুই ভাল লাগে না। আমার সবই বিশ্রী।

উদয় হেসে ফেলে,—কে বললে, তোমার রাগটা ভারী চমৎকার। ওতে তোমার মনের আকাশটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে তোমার রাগ।

মধুমতী ওড়না মুখে চেপে গুম্ হয়ে বসে থাকে।

স্টেজে শেষ ঘণ্টা পড়ে।

মধুমতী বসেই আছে।

উদয় বলে,—কই যাও।

—না। যাবনা আমার খুসী।

—সেকি এতগুলো লোক এসেছে।

—আমি নাচব না।—তেমনি বসে থেকেই বলে মধুমতী।

—কেন কি হোল? রাগ কার ওপর?

—কারো ওপর নয়।

—তবে মিছি মিছি লোক হাসিয়ে ত' লাভ নেই।

বাইরে থেকে তাগাদা শোনা যায়,—মধুমতীদেবীর কি ড্রেস হোল? একটু তাড়াতাড়ি করুন। ড্রপ উঠেছে।

ড্রেসিং রুমের দোরটা ভাল করে এঁটে দিয়ে বসে পড়ে মধুমতী।

উদয় চমকে বলে,—একি করলে?

—কেন কি?

দোরটা খুলতে যায় উদয়।

মধুমতী বলে,—খুলোনা বলছি। ভাল হবে না।

উদয় রীতিমত বিরক্ত হয়,—তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই। এর পরও কি মুখ দেখাতে পারবে কারো কাছে! ছি, ছি!

—কেন মুখে আমার কি হয়েছে শুনি?

—আরও খুলে বলতে হবে।

—মুখ কি পুড়েছে?

—পুড়লেও ভাল ছিল।—উদয়ের চোখদুটো রাঙা হয়ে ওঠে। দোর খুলে কি করে বেরোবে ভেবে পায় না উদয়। ছি, ছি, দিদি যদি শুনতে পায়। যদি কিছু মনে করে! কুন্তলবাবু যদি এসে পড়ে থাকেন।

—কই ওঠো, ঠিক হয়ে যাও।

—না।

—কুন্তলবাবু যদি এসে পড়েন!—বলে উদয়।

মুহূর্তে মধুমতীর চোখদুটো চমকে ওঠে। তবু বলে,—এসে পড়লে পড়বে।

—কি জবাব দেবে তাকে?

—তোমার ওপর সব দোষ চাপিয়ে দোব।

—তাতে লাভ?

—লাভ আছে।

—কিন্তু সে লাভ আমি হতে দোব না।

মধুমতী উদয়ের কণ্ঠে হয়তো বা রাগের আভাস পেয়ে নরম হয়ে যায়,—আচ্ছা একটা কথা যদি শোন, তবে এখুনি স্টেজে যাব।

—কি ?

—উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে আমার নাচ তোমায় দেখতে হবে।

—দেখব।

—ঠিক ?

উদয় বলে,—ঠিক। নাও দোর খোল।

এবার দরজা খুলে বেরোয় মধুমতী।

সামনে দু একজন অপেক্ষা করছিল তাদের ধমকে বলে মধুমতী, —এখান থেকে যান।

সবাই সরে গেলে উদয়কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলে।

উদয় স্টেজে আসে ধীর পদক্ষেপে।

উইংস্-এর পাশে দাঁড়ায়।

মধুমতী উদয়ের একবার তাকিয়ে স্টেজে ঢোকে। সংগে সংগে করতালি ধ্বনি ও কলরোল শোনা যায়।

নৃত্য সুরু হয়। বসন্ত নৃত্য। বসন্তরাণী ঘাগরা ফুলিযে মুখ নীচু করে বসে আছে স্টেজের ওপর ঠিক একটি ফুলের মত। পাতলা হলদে আর সবুজ আলোর রশ্মি এসে পড়েছে তার ওপর। বাহার সুরে সারেঙ্গী সুর ধরে, যেন ডাকে মৃদু স্বরে, জাগো! জাগো! বসন্তরাণী! জাগো!

সেতারের আলতো ঝঙ্কার, সারেঙ্গীর ক্রন্দন, অনুরোধ। আবার সেতারের শব্দস্ফোট। যেন বসন্তরাণীর প্রাণ স্পন্দন সুরু হয়েছে।

পূর্ণ নীরব প্রেক্ষাগৃহ অপেক্ষা করে মধুমতী দেবীর বসন্ত নৃত্য! বসন্তই যেন নেমে আসে প্রতিটি দর্শকের মনের ওপর।

বসন্তরাণী জাগে। ধীরে ধীরে জাগে। মধুমতীর আলতো পায়ের চাপে ঘুঙুরের রেশ কানে ভেসে আসে।

চারদিকে তাকায় বসন্তরাণী। খুসীর আভাষ! চারদিকে আজ শুধু খুসী। ফুল জাগে। কোকিল জাগে। সারেঙ্গীর তারে কোকিলের স্বর! সব জাগল। বাসন্তীকার খুসী ভরা মুখে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। মধুমতীর আয়ত বিস্ফারিত কাজল পরা চোখ দুটো নেচে ওঠে তবলার মৃদু তালে। তারপর বসন্ত বাহার! ঘুঙুরের বোল খুসীতে মেতে ওঠে আজ। বসন্ত এলো! বসন্ত এসেছে!

নৃত্যের চাঞ্চল্যে ওড়না উড়ে যায়, মালা ছিঁড়ে যায়। আজ মধুমতীর নৃত্য যেন সকলকে অবাক করে দেয়। প্রাণে স্পন্দন আনে। সত্যিই বসন্তের আগমনের স্পন্দন!

নৃত্যের এক একটা ঝঙ্কারে হাততালি আর উচ্ছ্বাস!

আজ মধুমতীর নৃত্য যেন প্রাণ পেয়েছে। সামনের চেয়ারে বসে কুন্তলবাবুও মুগ্ধ হন। বড় ভাল লাগছে আজ মধুমতীকে। কাজল চোখের ইশারায় আর হাতের মুদ্রার তীক্ষ্ণতায় দুলে দুলে ওঠে বুকের ভেতর।

আজ অনেকক্ষণ নাচতে পারে মধুমতী।

নাচ শেষ হয়ে যায়। দর্শকদের উল্লাসিত চিৎকার।

মধুমতী স্টেজ থেকে ছুটে ভেতরে গিয়ে দেখে উদয় গালে হাত দিয়ে বসে আছে উইংস্‌য়ের পাশে। ওর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে মধুমতী পোষাক ঘরে। ঘুঙুরের শব্দে মঞ্চ কেঁপে ওঠে।

জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে মধুমতী যেন আনন্দে আত্মহারা

হয়ে গেছে আজ।

—আজ তুমি ছিলে, তাই এত ভাল নাচ হোল!—ওর বুক দুলে দুলে ওঠে, নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। মধুর চোখ দুটো নীচু হয়ে যায়। উদয়ের চোখে বিদ্যুত দেখা দেয়, তার চেয়েও কঠিন কণ্ঠে বলে,—তোমার মনোভাব আমার অজানা নেই, যদি মিথ্যে রঙ কখনও তোমার মুছে যায়, তখনই আমার কাছে আসতে পারো, তার আগে নয়।

উদয় চলে যায় ঘর থেকে বেরিয়ে। মধুমতী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মুখও কঠিন হয়ে ওঠে ক্রমশঃ! কিছুক্ষণ পরে কুন্তলবাবু আসে।

কুন্তলবাবু শুধোয়,—উদয় কই?

—চলে গেছে। বলে মধুমতী বলে,—চলুন আমরা আজ একটু বেড়াব।

—চলো। কুন্তলবাবু তাকে নিয়ে গাড়ীতে ওঠে।

গাড়ী চলতে থাকে। দুজনেই প্রথম দিকটায় একটু চুপচাপ থাকে। মধুই প্রথম কথা বলে,—আমি ঠিক করেছি ভেবে।

—কি? কুন্তলবাবু মধুর পাশে সরে আসে একটু।

মধু কুন্তলবাবুর একখানা হাত কোলে তুলে নেয়।

—আপনি আমার কাছে যা চেয়েছিলেন, তাতে অমত করবার মত শক্তি আমার নেই।

কুন্তলবাবু হাতটা ওর কোলের ওপর চেপে বলে,—তবে বাধা কিছু নেই তোমার দিকে?

—না, আপনার দিকে আছে।

—কি শুনি?

—দিদির কথা ভেবেছেন কিছু।

কুন্তলবাবু সহসা উত্তর দিতে পারেনা, একটু চুপ করে থেকে বলে,—হ্যাঁ ভেবেছি।

—কি ?

—সে যেমন আছে তেমনিই থাকতে পারে, বা যা ইচ্ছে তার করতে পারে।

—কিন্তু সে যদি বাধা দেয় ?

কুন্তলবাবু একটু হাসে,—তার সে সাহস নেই মধু। তোমার দিদিকে তুমি চেনো না। ও বড় ভীতু।

মধুর স্বরে একটু ঈর্ষা প্রকাশ পায়,—কিন্তু আপনি যা ভাবছেন, তা না হতেও পারে! স্বামীর অধিকার সহজে কোন মেয়ে মানুষ ছাড়তে চায় না তা সে যত ভীতুই হোক। তাছাড়া দিদিকে আপনি ঠিক উল্টো বুঝেছেন। তার মত গোঁয়ার মেয়ে খুব কমই আছে।

কুন্তলবাবু চুপ করে থাকে। ভাবে, তবে কি তার ইন্দুমতীকে চিনতে ভুল হোল ? মধু যা বলছে তাই কি সত্যি ? কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না।

মধুমতী কুন্তলবাবুর কাঁধের কাছে চোখ হেলান দিয়ে বসে বলে, —তাহলে কি করবেন ?

কুন্তলবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—তাহলে তার এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে।

—একথা আপনার ঠিক ত' ?

—ঠিক।

—তবে বিয়েতে আমার আপত্তি নেই। আর একটা কথা।

—কি ?

—ওই উদয় ছেলেটি ভাল নয়। ওকে সরাতে হবে।

কুন্তলবাবু আবার সহসা উত্তর দিতে পারে না, একটু থেমে বলে,—বেশ, কালই তাকে চলে যেতে বলবো।

মধুমতীর স্বরের একটু পরিবর্ত্তন হয় যেন।—কালই ?

—হ্যাঁ! কালই।—কুন্তলবাবুর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক গম্ভীর।

মধুমতী চুপ করেই থাকে।

কুন্তলবাবু ধীরে ধীরে বলে,—কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধে ভাববার আমায় একদিন সময় দাও।

—বেশ!

মধুমতীর মনে তখন একটা কথাই ঘুরে ফিরে বেজে ওঠে,—উদয়কে কালই চলে যেতে হবে। কেন উদয় যাবে? দরিদ্র একটি যুবক, হয়ত বা খেতেই পাবে না! কেন মধুমতী উদয়কে এমন করে তাড়ালো? নিজে ভেবে নিজেই কোন উত্তর পায় না মধুমতী।

উদয় থিয়েটার থেকে বাড়ী এসে কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে লিখতে বসে।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দুমতী আসে।

—মধু কোথায় ভাই?

উদয় ফিরে তাকায়,—জানিনে ত' দিদি।

—তোমার সঙ্গে আসেনি?

—না দিদি, আমি একটু আগে চলে এসেছি। বোধ হয় কুন্তলবাবুর সঙ্গে আসবে।

ইন্দুমতী একটু অবাক হয়ে বলে,—কিন্তু তোমার সঙ্গেইত আসবার কথা।

—আসবার কথা থাকলেইত' আর আসতেই হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না দিদি। যেমন আমার এখানে থাকবার কথা, অথচ এমনও হতে পারে হয়ত এখান থেকে শিগ্‌গির চলে যেতে হবে।

উদয় ম্লান হাসে।

—কেন ভাই!—ইন্দুমতীর মুখ শুকিয়ে যায়।

উদয় তেমনি হেসেই বলে,—চিরদিনই কি আপনার কাছে থাকব?

ইন্দুমতী ওদের অবস্থা সব জানে, তাই একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বলে,—কিন্তু কোথায় যাবে?

—তা ত' জানিনে দিদি। জুটে যাবে আবার কোন এক জায়গা।

—যদি কাজ না পাও।

—তবে যা হয় হবে। ভবিষ্যত ভেবে কাজ করা সব সময় ত'

চলেনা দিদি। সংসারে হঠাৎ এক একটা কাজ করে ফেলতে হয়।

ইন্দুমতী কথা বলতে পারে না। উদয় চলে যাবে। ওর নরম মনের কোথায় যেন উদয় এতদিন ধরে তিলে তিলে ভাইয়ের স্নেহ পেয়ে এসেছিলো, কিন্তু সে যে এত বেশী, তা কে জানত? তার নিজের ভাই নেই। উদয়কে নিজের ভাই ভাববার চেষ্টা করেছিলো ইন্দুমতী মনের কোন দুর্ব্বলতার ফাঁকে। কিন্তু সেটুকুও সইল না ইন্দুমতীর বরাতে।

ইন্দুমতীর চোখ ছলছল করে।

—বিপদে যদি পড়ো, দিদির কাছে আসতে লজ্জা করবে না বলো।

—কথা দিতে পারিনে দিদি। মনে যদি পড়ে তবে দেখা যাবে।

ইন্দুমতী চোখের জল সামলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

উদয় চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। ইন্দুমতীর মত দিদি হারাতে বসে তার আজ বুক অবশ্য ভেঙে যাচ্ছে না, তবুও একথাই বা কি করে অস্বীকার করা যায় যে ইন্দুমতীকে মনে মনে বার বার প্রণাম করলেও তার স্নেহের ঋণ শোধ হয়ে যায় না। দেশের মেয়েরা যদি সবাই মধুমতীর মত হোত, তবে সংসারটা সহজেই নরক হয়ে যেত! দেশের ভাগ্য যে, ইন্দুমতীর মত দিদিরা আজও বেঁচে আছে!

এখানে উদয়ের থাকা আর হবে না—একথা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছে, এবং একথাও সত্যি যে এখান থেকে চলে যাবার দুদিন পর থেকেই উপোষ করে মরতে হবে। যদি কোন কাজ না জোটাতে পারে সে। তবু যেতে হবে। যেতে তাকে হবেই।

পরদিন ঠিক কুন্তলবাবু উদয়কে ডেকে পাঠায়। দু'চার কথা পরেই বলে,—তোমাকে রাখতে আমার একটু অসুবিধে হচ্ছে, তুমি যদি

কাল এখান থেকে চলে যাও। অবশ্য তিনমাসের মাইনে তোমাকে আমি দিয়ে দোব!

উদয় বলে।—কেন আজ গেলেও ত'হয়।

—না, আজ নয়। কাল বিকেলে বা পরশু সকালে যাবে।

—বেশ!—উদয় আর কথা না বলে বেরিয়ে আসে।

ইন্দুমতী সমস্তদিন মধুমতীর সঙ্গে কথা বলে না। সে বুঝতে পেরেছে যে উদয়কে মধুই তাড়ালো। সমস্তদিন কিছু খেতেও পারে না ইন্দুমতী। কেবলই উদয়ের কথা মনে পড়ে, চোখে জল আসে। মাঝে মাঝে ভাবতে চেষ্টা করে কোথাকার একটা ছেলের জন্যে আমারই বা এত কি মাথা ব্যথা। কিন্তু মন যে মানে না।

রাত্রে শোবার পরে আজও ঘুম আসে না ইন্দুমতীর। আগাগোড়া ব্যাপারটা ভেবে কেবলই কান্না পায় যেন। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হয়ে আসে। আজও ইন্দুমতী ওঠে, কিন্তু আলো জ্বালে না। অন্ধকারেই কুন্তলবাবুর খাটের কাছে গিয়ে পাশে বসে।

—শুনছো?

উত্তর নেই কুন্তলবাবুর।

আবার একটু ধাক্কা দেয় কুন্তলবাবুকে,—শুনছো?

এবারে গম্ভীর উত্তর আসে শায়িত কুন্তলবাবুর কাছ থেকে,—বলো!

—আচ্ছা, তুমি কি আরম্ভ করেছ বলোত?

ধীরে উত্তর শোনা যায় কুন্তলবাবুর,—আরম্ভটা তুমিই কোরেছ। আমি শেষ করছি মাত্র।

ইন্দুমতী বলে অনুরোধ করে,—মনটা পরিষ্কার করো না কেন? কি আরম্ভ আমি করেছি স্পষ্ট করে বলতেও কি বাধা আছে?

—আমিও তোমাকে ঠিক ওই কথাই বলি।

ইন্দুমতী বলে,—কিন্তু আমিত' বারবার তোমাকে বলেছি, আমার দোষ আমি নিজেই জানিনে। না বললে কি করে বুঝব বলো?

—আজ ছ' বছর ধরেই শুনে আসছ, তোমার কি দোষ!

—অ! হ্যাঁ, সে দোষ স্বীকার করি।

কিন্তু আমায় তারপর কি করতে বলো?

—তুমি বিয়ে করো, তাও ভালো, তবু এমন চুপ করে থেকে আমাকে তিলে তিলে জ্বালিও না!—ইন্দুমতীর চোখে জল আসে।

—যদি তাই-ই করি।

ইন্দুমতী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে,—যদি নয়, তুমি মধুকেই বিয়ে করো। আমি সবই বুঝতে পারছি। তবু তুমি যাতে ভালো থাকো, শান্তিতে থাকো তাই করো। আমার যা হয় হবে।

—তুমি কি করবে তবু শুনি।

—কোথায় হয়ত চলে যাব।—চোখের জল আজ আর বাধা মানে না।

কুন্তলবাবুর কণ্ঠে বিদ্রূপ,—কার সঙ্গে যাবে। সে প্রিয়তমটি কে?

ইন্দুমতী স্তব্ধ হতবাক হয়ে যায় প্রায়।

আবার বলে কুন্তলবাবু,—তুমিও আবার বিয়ে করতে পারো। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

—কি বোলছ তুমি! আমাকে কি পাগল করে দেবে!—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ইন্দুমতী।

—বলছি ঠিকই।

—একথা তুমি ভাবতে পারলে কি করে! তুমি কি হলে গো!—

ইন্দুমতীর চোখের জল আজ আর বাধা মানে না।

কুন্তলবাবু বলে,—প্রমাণ না পেয়ে ভাবিনি।

—কি প্রমাণ পেয়েছ শুনি ?

কুন্তলবাবু লাফিয়ে ওঠে বিছানা থেকে। আলো জ্বালিয়ে নিজের বাক্স থেকে ছোট কাগজের টুকরোটি বার করে ছুঁড়ে দেয় ইন্দুমতীর দিকে,—এটা কি। এটা উদয় যে বই ফেরত দিয়েছিলো, সে বইয়ে ছিল কেন ?

বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকে কুন্তলবাবু।

ইন্দুমতী দেখে কাগজটা। লেখা তাতে, 'রাগ কোরনা। তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসি না।'

দুচোখ আবার জলে ভরে আসে ইন্দুমতীর,—'আচ্ছা, তুমি কি ! কান্নায় ভেঙে পড়ে ইন্দুমতী।

কুন্তলবাবুর বুকের ভেতরটা বোধ হয় হাল্কা হতে থাকে।

—এ লেখা যে তোমাকেই, একথা মনে নেই ?

—আমাকে !—কুন্তলবাবু অবাক।

—চার বছর আগের কথা মনে থাকবে কি করে। এখন ত' আর মন তোমার নেই ! এখন দিনরাত্রি শুধু কি করে আমাকে মেরে ফেলবে সেই চেষ্টা। তার চেয়ে একেবারে মেরে ফেলো !

কুন্তলবাবু গভীর চিন্তায় ডুবে যায়।

—চারবছর আগে একদিন রাত্রে রাগারাগি করে সকালে না খেয়ে বেরোচ্ছিলে ; আমি ওই টুকরো কাগজটা তোমার হাতে গুঁজে দিলুম। মনে নেই, একথা মনে থাকবে কেন।

কুন্তলবাবু একটা কথাও বলে না।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। অনেক পরে হয়ত বা তার মনে পড়ে কি না কে জানে !

বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ইন্দুমতী ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

অনেক পরে কুন্তলবাবু ইন্দুমতীর পিঠে একটা হাত রাখে,—আমার ভুল হয়েছিলো ইন্দু!

ইন্দুমতী অশ্রুর বেগে কথা বলতে পারেনা।

—আমাকে ক্ষমা করো ইন্দু।

ইন্দুমতীকে দুহাতে টেনে নেয় কুন্তলবাবু নিজের কাছে। ওর চোখের জলে ভেজা সমস্ত মুখখানা নিজের বুকের কাছে আনে। ইন্দুমতী চোখ বোজে।

ভোরে উঠে ইন্দুমতী মধুমতীর ঘরের দিকে যায়।

মধুমতী ভোরে ওঠে না। সাড়ে আটটা নটার আগে বিছানা থেকে ওঠা কোনদিনই ওর হয় না। ভোরে যদি বা ইন্দু কোন কোন দিন কড়া করে দু কাপ চা খাইয়ে টেনে তুলেছে, কিছুক্ষণ পরেই আবার এসে শুয়ে পড়েছে মধুমতী। উঠেছে হয়ত বেলা সাড়ে দশটায়।

আজ কিন্তু মধুমতী এক ডাকেই সাড়া দিলো। বেশ বোঝা গেল ঘুমোয়নি সমস্ত রাত।

সব রাত্রিটাই ওর চোখের সামনে ফুটে উঠেছে উদয়ের অসহায় দুটো চোখ। উদয় কোথায় যাবে, কি খাবে এই চিন্তা। কোথাকার কোন একটা ছেলে, তার জন্যে কেন যে তার সমস্ত রাতটা ঘুম হল না ভেবে অবাক লাগে ওর নিজের। অমন কত ছেলেত' নিজেকে বলি দিয়ে দিতে পারে তার একটু কৃপা লাভের মূল্যে। কিন্তু তবু ঘুরে ফিরে কেবলই উদয়ের কথাটাই ওর মনে আনাগোনা করেছে। থিয়েটার থেকে চলে আসবার সময় সেই দৃঢ় কঠিন ঠোঁটের ফাঁকে এক অনমনীয় প্রতিজ্ঞা। চোখে ভাবলেশহীন স্থৈর্য। লম্বা লম্বা চুলে তেল নেই। ঢোলা পাঞ্জাবী পরা দীর্ঘ দেহ নিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল উদয়। একবার তাকালেও না পিছন ফিরে। কোথায় যে উদয়ের এই ভরসা কে জানে। কোথায় এ অসাধারণ শক্তির উৎস কে জানে।

ভেবে মধুমতী কুলকিনারাই পায়নি সমস্ত রাত। উদয় যে চলে

যাবেই এ কথা ও নিশ্চিত জানে। আরও জানে যে কোথায় যাবে। কি করবে একথা সে কাউাক বলবে না। বলতে পারে মাত্র একজনকে। দিদিকে বলতে পারে। দিদিকে যে উদয় কতখানি ভালবাসে একটু কথাতেই সেটা ধরতে পারা যায়। দিদিও যেন ভাই বলতে অজ্ঞান।

জ্বলতে থাকে মধুমতী। তার ভালবাসাটা উদয় কোনদিনই বুঝলো না। সবই দিদি! সে আর ভালবাসতে জানে না! সে আর কারো জন্যে বিনিদ্র রাত্রে চিন্তাকুল হয় না। সে আর কারো জন্যে চোখের জল ফেলে না! সে আর কারো মুখে হাসি দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয় না! উদয় বুঝল না। না বুঝুক। তার ভালবাসার পরিচয়ে সে পেয়েছে উদয়ের কাছ থেকে ঘৃণা, উদয়ের কাছ থেকে নিদারুন অবহেলা। তবুত তার মন মানে না। এই যে মানসিক অত্যাচার! এই যে তার ওপর নীরব অবিচার! এটা কি উদয় ভাল করেছে। উদয় কি বোঝে না তার মনোভাব? নিশ্চয়ই বোঝে। তবু কেন উদয়ের ব্যবহার এমন হয় তার ওপর?

যাক সে উদয়কে বাড়ী থেকে বিদায় করে ভালই করেছে, চলে যাক সে দুচোখের আড়ালে। তবু হয়ত' তার অস্তিত্ব কখনও ভুলতে পারবে মধুমতী। তবু হয়ত অকারণ গঞ্জনা থেকে নিজেকে রক্ষা করা যাবে। যাবার আগে একবার দেখতে খুবই ইচ্ছে হচ্ছে। রাত্রে কতবার ভেবেছে। যাবে নাকি, ডাকবে নাকি উদয়কে। না, সে বড় ছেলেমানুষী হবে। তাছাড়া কুন্তলবাবু—

ইন্দুমতী ডাকে ইতিমধ্যে,—মধু ভোর হোল, ওঠ।

মধু সাড়া দেয়,—হ্যাঁ, উঠি।

গা মোড়ামুড়ি দিয়ে ওঠে।

ইন্দুমতী শুধোয়,—চা খাবিত'?

—হুঁ।

ইন্দুমতী চা আনতে যায়। চাকরকে বলে ফিরে আসে।

বলে,—শোন তোর সঙ্গে দুটো কথা ছিল।

মধুমতী বুঝতে পারে কি কথা। কুন্তলবাবুকে নিয়ে কথা। কিন্তু মধুমতী কুন্তলবাবুর ওপর তার অধিকার কিছুতেই ছাড়বে না। কুন্তলবাবুকে মধুমতী ছাড়তে পারবে না এতে দিদি যদি আজ তার পায়ে মাথাও খোঁড়ে, তাও সই।

মধুমতী কঠিন হয়ে তাকায়,—কি বলো!

ইন্দুমতী মিষ্টি স্বরে বলে,—কথাটা আমার নিজেরই মনে হয়েছে। ধারণাটা আমার ভুলও হতে পারে, তাই তোকে পরিষ্কার করে বলাই ভাল।

মধুমতী ভাবে পরিষ্কার করে বলেও কোন লাভ নেই, ধারনা ঠিকই হোক আর বেঠিকই হোক। যা হবার তা যাবার নয়। কুন্তলবাবুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা সম্বন্ধে ইন্দুমতী ধারণা পূরো সত্য। মধুমতী আজ কিছুমাত্র অস্বীকার করবে না সে কথা।

মধুমতী আরও কঠিন হয়ে ওঠে,—কি ধারণা তোমার শোনাই যাক।

—সত্যি কথা বলবি ত'?

—বলতে পারি নে।

—কেন, সত্যি বলতেও পারবি নে আমার কাছে?

—পারতেই যে হবে এমন ত' কোন কথা নেই।—মধুমতীর কথাগুলো বাঁকাবাঁকা।

ইন্দুমতী একটু অবাকই হয়,—আমার চেয়ে আপনার ত' তোর কেউ নেই?

—যদি বলি আছে।

—আমার চেয়ে আপনার ?

—হ্যাঁ।

ইন্দুমতীর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে অপমানে।

ম্লান মুখে নিম্নস্বরে বলে,—যাক্, কথাটা বলি—

মধুমতী বাধা দিয়ে বলে,—বলবার আর দরকার নেই। তুমি যা ভেবেছ, সেটা সত্যি। আর তাতে সায়েব বাবুর অমত করাতে তুমি পারবে না। আমার কাছেও চেষ্টা করা বৃথা।

—মানে! কি বলছিস তুই।

মধুমতী রাগে ফেটে পড়ে,—অত রাখা ঢাকার কি আছে। সাহেব বাবু যদি আমায় বিয়ে করতে চায় ত' আমি কি করতে পারি।

—ইন্দুমতী আকাশ থেকে পড়ে,—আমি ত' তোকে একথা জিগ্যেস করতে আসিনি।

—তবে ?—এবার মধুমতী একটু ভয় পায়।

—তুই পাগলের মত কি কতকগুলো কথা বলে ফেললি। তো... সাহেব বাবু তোকে বিয়ে করতে যাবে কেন ?

—যখন হবে তখন দেখতে পাবে।

ইন্দুমতী হাসে খুব,—আচ্ছা সে তখন দেখব। আমার এই কথাটার জবাব দে। উদয়কে কি তুই তাড়াচ্ছিস্ ?

মধুমতী যেন আকাশ থেকে হঠাৎ মাটির নীচে পড়ে যায়। সে ভেবেছিলো কুন্তলবাবুর সঙ্গে তার গোপন যে সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে তারই কোন আভাস পেয়ে দিদি জিগ্যেস করবে তাকে। চাই কি হাতে পায়ে ধরতেও পারে যে আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দে ভাই। কিন্তু এ যে একেবারে উলটো। দিদি উলটে তাকেই অভিযুক্ত করতে এসেছে উদয়কে তাড়াবার অপরাধে।

নিজের দুর্বলতা পুরোটাই নিজের কাছে ধরা পড়াতে মধু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে,—বলে,—বেশ করেছি তাড়িয়েছি। কে বললে তোমায়? কার কাছে শুনেচ?

ইন্দুমতী হাসে,—অত রাগ কচ্ছিস কেন রে?

এতক্ষণে চাকর চা নিয়ে আসে।

চায়ে চুমুক দিয়ে গলাটা ভেজায় মধুমতী।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চা খায়। তারপর নিজেকে কিছুটা সংযত করে বলে,—যদি তাড়িয়েই থাকি তোমার তাতে ক্ষতিটা কি?

—তোরই বা এতে কি এমন লাভ হোল। গরীবের ছেলে কোথায় যাবে বুড়ো মাকে নিয়ে!

—গরীব হলে চুলোয় যাবে।—রেগে বলে মধুমতী।

ইন্দুমতী ছোট বোনের রাগ দেখে হাসে,—গরীব বলে এত ঘেন্না ভাল নয় রে?

—না ওসব বাজে ছোটলোকদের বাড়ীতে রাখা পোষাবে না।

—উদয় ছোটলোক!

—নিশ্চয়ই।

—তবে আমিও ছোটলোক।

—উদয়বাবুর ওপর অত যদি দরদ থাকে। তবে তুমিও তাই।

—আমারও তবে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে বল!

—তোমাকেও এ বাড়ী ছাড়া করবার ক্ষমতা আমার আছে।

রাগে ঘামতে থাকে ইন্দুমতী,—তুই কি বলছিস মধু!

—আমি ঠিকই বলেছি। আমার ওপর এতদিনের অত্যাচারের ফল হাড়ে হাড়ে টের পাবে এবার।

—আমাকে তাড়াবি বাড়ী থেকে।—মাথাটা টলতে থাকে ইন্দুমতীর।

মধুমতীও রাগে জ্বলতে থাকে। কথা বলে না।

গাল বেয়ে টস্ টস্ করে চোখের জল পড়ে ইন্দুমতীর।

চোখের কোন দুটো রাঙা হয়ে ওঠে,—তুই আমায় তাড়াবি এ বাড়ী থেকে? এ বাড়ী কার?

—বাড়ী কার সেটা দুদিন পরে টের পাবে। আজই সায়েব বাবুকে বলে তোমার যাবারও ব্যবস্থা কোরব।

ইন্দুমতী অনেক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

চোখের জল শুকিয়ে যায়।

মুখ খানা কঠিন হয়ে আসে। বলে,—তোর সাহস সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

—সীমা তোমারই ছাড়িয়েছে।

ইন্দুমতী বলে,—তবে শোন। আমার কথা বাদই দিলাম, উদয় এ বাড়ী থেকে যাবে না। আমার হুকুম। তোর সায়েব বাবুকে বলিস, আমার হুকুম উদয় যাবে না।

মধুমতীর ঠোঁট দুটো বেঁকে যায় বাঁকা হাসিতে,—সায়েব বাবুকে মহারাণীর হুকুম জানাবো। কার হুকুমে কে যায় দেখা যাবে।

ইন্দুমতীর ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠে,—তুই এত ইতর হয়ে উঠেছিস মধু! আমার বাড়ীতে থেকে আমায় যা নয় তাই বলবি!

মধুমতী হাসে, বিদ্রূপের হাসি,—বলছি ত' তুমি যা করতে পারো করো।

—তাই কোরব। শাসন ছাড়া তোমাদের মত অসভ্য মেয়েকে ঠিক করা যাবে না।

—শাসনই করো একবার দেখি।—হাসে মধুমতী।

ইন্দুমতী রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যায়।

মধুমতী বিছানায় শুয়ে পড়ে।

খুব খানিকটা নিজের মনেই খিলখিল করে হাসে।

দিদির বিষদাঁত এবার ভাঙতে পেরেছে মধুমতী। এতদিনে তার মনটা যেন ভারী ভাল লাগছে। দিদির ঐশ্বর্য, দিদির মাধুর্য এতদিন তাকে যে ঈর্ষার পীড়া দিয়েছে আজ তার উপশম হোল কিছুটা।

অবশ্য সত্যিই সে দিদিকে তাড়াবে না। সায়েব বাবুকে কিছু বলবেও না। চোখের সামনে দিদিকে জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে একটু একটু করে রোগা করবে সে।

চোখের সামনে কুন্তলবাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

কুন্তলবাবুর সর্বস্ব অধিকার করে নেবে।

কুন্তলবাবুর নিশ্বাস প্রশ্বাসও তার আয়ত্বে আনতে হবে।

দিদি শুধু জ্বলবে আর কাঁদবে।

কি আনন্দ!

মনের বিকৃত আনন্দ ক্ষুধায় মধুমতী আকাশে সোনালী জাল বোনে সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

পায়ের ওপর পা রেখে পা নাচাতে নাচাতে ওর চিন্তা আরও কতকগুলো পাখা মেলে। কুন্তলবাবু সে স্বপ্নের নায়ক হয়ে ওর সামনে ভেসে ওঠে। কুন্তলবাবুকে ও উপভোগ করবার বাসনা আর ত্যাগ করবার কথা ভাবতেও পারে না।

কিছুতেই না।

সন্ধ্যায় উদয় যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। ইন্দুমতী এসেছিলো। বারণ করলো অনেকবার যেতে। উদয় কিন্তু ওই এক কথাই বলে,—না, দিদি, আর আমাকে অনুরোধ করবেন না। তাছাড়া আমি ত' কুন্তলবাবুর কথায় যাচ্ছিনা। আমার নিজেরও যেন আর ভাল লাগছিল না।

—তবে প্রতিজ্ঞা করো, বিপদে পড়লে আসবে আমার কাছে, নইলে যাওয়া চলবে না। আজ রাত্রে ত' যাওয়া হবেই না। মাংস রেঁধেছি তুমি যেমন ভালবাস তেমনি করে। যা বললুম প্রতিজ্ঞা করো?

উদয় হেসে বলে,—বেশ, তাই প্রতিজ্ঞা করলুম।

ইন্দুমতী চোখ মুছে চলে যায়।

মধুমতী কুন্তলবাবুর ঘরে আসে।

—কই সায়েববাবু বেরোবেন না?

মধুমতীর পরনে পাতলা সাড়ী। সাজে সজ্জায় কাজলে, লালে, মধুমতীর ভেতর থেকে শামুকের মত এক বিকৃত লালসার মূর্তি উঁকি মারে।

কুন্তলবাবুর অত্যন্ত কদর্য মনে হয় আজ মধুমতীকে! ইন্দুমতীর পবিত্রতার সঙ্গে মধুমতীর তুলনা করে আজ কুন্তলবাবুর চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে যেন সব।

—চলুন বেড়াতে যাবেন না?

কুন্তলবাবু গম্ভীর স্বরে বলে,—যাব, একটু পরে।

মধুমতী আঁচলটা দুবার নাড়া দেয়। আজ সমস্তদিনই যেন কুন্তল বাবু গম্ভীর। কাজেও বেরোয়নি আজ।

একটু উস্‌খুস্‌ করে মধুমতী আস্তে বলে,—আপনি কি ভাবলেন?

—কিসের কি?

—বা! কাল সন্ধ্যার কথা মনে নেই?—মধুমতী চোখে বিদ্যুৎ হানে।

কুন্তলবাবু হো হো করে হাসতে থাকে।—তাই বলো!

—হাসছেন যে?

—তুমি কি ইয়ার্কীও বোঝ না? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি? ইয়ার্কীর নয়?

ইয়ার্কী! ঠাট্টা!—মধুমতীর মুখটা অকস্মাৎ সাদা হয়ে যায়।

ওর চাঞ্চল্যে অকস্মাৎ যেন প্রচণ্ড আঘাত লাগে!

—কিন্তু তেমন ত' মনে হয়নি।

—হুঁ! সেইটেই আমি দেখছিলাম,—তোমার দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে এবিষয়ে। আমি ভাবছি তোমাকে খুব কড়া কোন বোর্ডিংয়ে দোব। নইলে তোমার এ বিশ্রী স্বভাব শুধরোবে না।

কড়া বোর্ডিং! বিশ্রী স্বভাব! মধুমতীর মাথায় কি বাজ ভেঙে পড়ল! দিদিকে বলা হয়েছে ঠাট্টার কথা!

মধুমতী পাষান হতে থাকে ক্রমশ!

—না, এ অত্যন্ত খারাপ ভাবসাব! এটা ঠিক ভাল নয়। অবশ্য এ বিষয়ে তোমার দিদিই তোমাকে বলবে! যাও তার কাছে যাও।

মধুমতী ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে যায়।

মধুমতী আজ কাঁদে। যে মধুমতীর চোখে কখনও জল দেখেনি, সেই লাবণ্যময়ী রূপসী নর্তকী উর্বশীর মত নিটোল যৌবন নিয়েও কাঁদে।

সে কুৎসিত! সে ভাল নয়! সে বিশ্রী! তার সঙ্গে ঠাট্টা।

মধুমতী এত হাল্কা, এতই খেলো! এতবড় অপমান! সে কোথায় যাবে এ অপমানের পর? কি করবে? বাবা নেই তার! কেউ নেই! বুক ঠেলে কান্নার বেগ আসে। নিজের ওপরের চাঞ্চল্যের প্রলেপ যেন ধুয়ে যায় চোখের অজস্র জলে। শরীর হাল্কা হয়ে আসে। ভেতরে গভীর হয়ে আসে। ধীরে ধীরে সে কুন্তলবাবুর দেয়া সমস্ত আভরণ সজ্জা খুলে ফেলে। বাবার দেওয়া সাদা সাড়ীখানা পরে।

রাত্রি তখন অনেক হবে। আকাশটা কালো। নিরেট বুক চাপা অন্ধকার যেন। শুধুপায়ে সিঁড়ি দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে নেমে আসে মধুমতী নীচে উদয়ের ঘরে।

উদয় মুখ নীচু করে কিছু একটা লিখছিলো হয়ত।

মধুমতী এসে নীরবে ওর পেছনে দাঁড়ায়।

অনেকটা লেখা শেষ করে উদয় মুখ তুলেই ওর ছায়া দেখতে পায় সামনে। ভ্রূ দুটো কুঁচকে পিছন ফিরে ওর দিকে তাকায়।

চুপ করেই দাঁড়িয়ে থাকে মধুমতী।

উদয়ের চোখে বিস্ময়ের ভাব জাগে! এও কি সম্ভব। উঠে দাঁড়ায়। কাছে এগিয়ে আসে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আরও বিস্মিত হয়। চোখের ভাষা পড়তে জানে উদয়। চোখের আধভেজা পাতাদুটি তখনও সরল—নরম। খুব অসহায় ভাব একটা ধরা পড়ে ওর চোখে। কোথায় সেই কামনা উন্মাদনা, কোথায় সেই চোখের সুতীব্র ইশারার মোহময় ঝিলিক্। চোখের কাজল আর ঠোঁটের লাল ধুয়ে গেছে অজস্র চোখের জলে।

উদয় অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবে।

—আমি তোমার কাছে এসেছি!—বলতে বলতে গলা কেঁপে ওঠে মধুমতীর।

উদয় আবার তাকায় ওর দিকে। চোখে ওর সব ধরা পড়ে যেন। ওর নিরাভরণ দেহ আর সাদা সাড়ী রিক্ততার কথা জানিয়ে দেয়।

—সময় হয়েছে তবে। কিন্তু এত শীগ্‌গিরি ভাবিনি!—ধীরে ধীরে

বলে উদয়।

মধুমতীর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ে।

উদয় ওর সব বুঝেছে। একমাত্র উদয়ই ওকে আগাগোড়া ধরতে পেরেছিলো।

উদয়ের একখানা হাত ধরবার চেষ্টা করে মধুমতী।

হাত ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নেয় উদয়,—আর একটু ভাবতে দাও।

মধুমতী জোর করে ওর একখানা হাত ধরে। যেন একমাত্র সহায়!

উদয় হাসে, জোরে।

মধুমতীর চোখে জল।—আর কেউ ত' আমাকে বোঝেনি, কার ওপর জোর করব, আরও অনেক সময় কাটে।

উদয় ওকে নিয়ে জানালার ধারে আসে।

সামনে বিরাট ঘন নীল আকাশ।

দেখছো কত বড় আকাশ!

মধুমতী দেখে।

উদয়ের স্বর গভীর হয়ে আসে। আকাশে নীল মনে হয় দূর থেকে। কত রঙ হয় আকাশের। সাত রঙা রামধনু! কিন্তু আসলে আকাশের কোন রঙ নেই। রঙটা সত্যি মনে হলেও সত্যি নয়। আজ আর তোমার মেথো রঙ নেই মধুমতী!

মধুমতী উদয়ের কাঁধে মাথাটা রাখে। ভারী দুর্ব্বল মনে হয় আজ, বড় অসহায়!

উদয়ের বাম কাঁধটা মধুমতীর চোখের জলে ভিজে ওঠে।

আজ মধুমতী ভাল করে দেখে আকাশ কত বড় আর কত ঘন নীল। কিন্তু সত্যিই ত' আকাশ নীল নয়। ওটা মিথ্যে। মিথ্যেই!